যুগলবন্দী গল্পকার

তারাশঙ্কর - মানিক

সম্পাদনা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

Scanned with OKEN Scanner

যুগলবন্দী গল্পকার : তারাশঙ্কর মানিক

সম্পাদনা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রজ্ঞা বিকাশ

৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০০০৯

Scanned with OKEN Scanner

সূচিপত্র

[ক] প্রসঙ্গকথা

বাংলা ছোটগল্প : তারাশঙ্কর ও মানিক ● ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ক-ফ

[খ] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প

জলসাঘর ● বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৫

তারিণী-মাঝি ● বিশ্বনাথ রায় ১২

নারী ও নাগিনী : বাসনার বিষম ত্রিভুজ ● কুন্তল চট্টোপাধ্যায় ৪৬

'কালাপাহাড়' ● শুভঙ্কর ঘোষ ৫৬

'বেদেনী' ● দিব্যজ্যোতি মজুমদার ৬৯

'ডাইনী' ● শতদ্রুশোভন চক্রবর্তী ৭৯

'পৌষলক্ষ্মী' ● রামকুমার মুখোপাধ্যায় ৯৩

'অগ্রদানী' ● ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ৯৮

টহলদার ● প্রত্যুষকুমার জানা ১১৮

রাখাল বাঁড়ুজ্জে ● তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ১২৯

পদ্মবউ ● শীতল চৌধুরী ১৩৩

খাজাঞ্চিবাবু ● প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত ১৩৮

প্রতীক্ষা ● প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত ১৪৭

ডাকহরকরা ● অন্তরা মিত্র ১৫৪

'ট্যারা' ● দেবাশিস বিশ্বাস ১৬৩

মধুমাস্টার ● প্রত্যুষকুমার জানা ১৬৭

না ● ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮১

Scanned with OKEN Scanner

টহলদার : মনস্তাত্ত্বিকতায় রূপনির্মিতিতে

প্রত্যুষ কুমার জানা

বাংলা কথাসাহিত্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় – বিভুতিভূষণ, মানিক, তারাশঙ্কর। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের অবলম্বন যেমন ইছামতি তীরবর্ত্তি গ্রাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চল তেমনি তারাশঙ্করের কথাসহিত্যের অবলম্বন-রাঢ় অঞ্চল তথা বীরভূম। সেখানে কেবলমাত্র রাঙামাটির গন্ধই নয়, সেই সঙ্গে মাটির মানুষের সন্ধান, তার আপন ভাষা, টুকরো টুকরো আঞ্চলিক হাসিকান্না-স্থানিক-আতি আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই বীরভূম রক্তমাংসের জীবন্ত মূর্ত্তি নিয়েই উঠে এল-তারাশঙ্করের গল্পে। শুধু বিলীয়মান জমিদার শ্রেণিই নয়—

> "জমিদার শ্রেণী ছাড়াও বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকহরকরা প্রভৃতি যারা সমাজের বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল তাদের নিয়ে গল্পকরবার প্রেরণা হোক বা অভিপ্রায়ই হোক আমার মধ্যে এসেছিল, বোধ করি এদের কথা কেউ বিশেষ করে আগে লেখেন নি"[১]

ফলে জন্মনিল চিনুমণ্ডল, তারিণী মাঝি, রংলাল, দীনুডাকহরকরা, হিংস্র খুনী কালী বাগদী, অন্ধ ভিখিরী পঙ্খী, খোঁড়া শেখ, শশীডোম, টহলদার রামদাস বাউল—লালমাটির ধূসরতা নিয়েই নির্মম রূক্ষ কঠিন সৃষ্টির প্রতীক হয়েই তারাশঙ্করের গল্পে উপস্থিত হয়েছে। তারাশঙ্করের ছোটগল্পের কেন্দ্র বিন্দু এই মানুষ তার গল্পের ইপ্সিত লক্ষ্য এই মানুষ—বিচিত্র ধরনের মানুষ। "তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে গল্পের প্রধান আকর্ষণ তথা অনুভব-কেন্দ্র হল গল্পের প্রধান চরিত্রটি"[২] আমাদের আলোচ্য 'টহলদার' গল্পের প্রধান আকর্ষণ ও টহলদার রামদাস বাউল। নৈতিকতার মানদণ্ডে তাঁর গল্পের চরিত্র গুলোর ভালো মন্দ বিচার্য হয়ে উঠেনি—

> "তিনি কেবলই দেখেছেন বৈচিত্র্য, দেখেছেন সত্যের অদ্ভুত, আশ্চর্য, স্তব্ধ করে দেওয়া মূর্ত্তি। এখানেই তারাশঙ্করের শিল্পী চরিত্রে ধ্রুপদী উপাদানের অনুপ্রবেশ। এই শিল্প দৃষ্টির লক্ষণই হল এক আপাত নিরাসক্তি। নিরাসক্তি এই অর্থে-মানবসৃষ্ট নৈতিকতার অনুশাসন দিয়ে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার তো সে প্রদর্শন করেনা। প্রচলিত অর্থে মমত্ব বা সহানুভূতি ও সে প্রদর্শন করে না। এই নিরাসক্তি কেবল মহাকালের মতো শান্ত ও স্থির অপলকে জন্ম-মৃত্যু বদ্ধ মানুষের অস্তিত্বের যন্ত্রণাকে দেখে যায়। সে জানে এই-ই মানুষের নিয়তি। এর থেকে মানুষের মুক্তি নেই"[৩]

'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার ১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের টহলদার' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচ্য প্রবন্ধের শিরোনাম টহলদার : 'মনস্তাত্ত্বিকতায় - রূপনির্মিতিতে' থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদের আলোচনার দুটি অভিমুখ (১) টহলদার গল্পের মনস্তাত্ত্বিকতার বিশ্লেষণ-এই বিশ্লেষণের অবলম্বন ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন মূলকতত্ত্ব। (২) টহলদার গল্পের শিল্প রূপের বিশিষ্টতার বিশ্লেষণের প্রয়াস।

Scanned with OKEN Scanner

।। ১ ।।

মানব মনের গঠনে ফ্রয়েড অদস্ (Id) অহম্ (ego) অধিশাস্তা-(super ego)র অস্তিত্বের কথা বলেছেন। অদস্ নির্জ্ঞান, অনৈতিক, সুখভোগ নীতিতে বিশ্বাসী, নিরপেক্ষ বাস্তবতাকে সে বোঝে না। সে যুক্তি বিশ্বাস করে না। সমস্ত অবদমি, ধারণা ও প্রবৃত্তির উৎস হল অদস। যৌন প্রবৃত্তির শক্তি অদমের মধ্যে জমা আছে। প্রাগৈতিহাসিক অভ্যাস গঠনে সে সাহায্য করে, জাতিগত বিবর্তনের সমস্ত অভিজ্ঞতা অদসে সঞ্চিত থাকে।

অহমের বেশির ভাগটাই সচেতন, স্বায়ত্তশাসিত তবে কখনো কখনো অধিশাস্তা এর উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বহির্জগত অহমের কর্মস্থল। নৈতিক নির্দেশকে অহম মেনে চলে। স্থান ও কালের জ্ঞান একমাত্র অহম বুঝতে পারে। অদস্ বহির্জগৎ-বাস্তবতা ও অধিশাস্তার শক্তির মধ্যে মধ্যস্থতা করতে হয়। অদম্ যাতে তার খেয়াল খুশি মতো চলতে না পারে সেজন্য ঘুমের মধ্যেও প্রহরী (censor) অহম, অহমের সমস্ত চিন্তা ভাষায় প্রকাশিত।

অহম থেকেই অধিশাস্তার উৎপত্তি, তাসত্ত্বেও অহমের কাজের সমালোচনা করে থাকে-সময় সময় তাকে পরিচালনাও করে। অধিশাস্তা অদসের বিপরীতধর্মী হলেও তার সঙ্গে এর সংযোগ আছে। জাতিগত ও জাতির বিবর্তনগত বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক আছে। ঈডিপাস এষণা এবং জীবনের গোড়ার দিকের আবেগপূর্ণ ক্রিয়া ও তৎসহ সেগুলোর প্রতিক্রিয়ারাজিও অধিশাস্তার মধ্যে থাকে। অধিশাস্তার জন্যই অহম নীতি বিগার্হিত কাজ করলে নিজেকে অপরাধী বোধ করে। বিবেককে সাধারণত অধিশাস্তা বলা হলেও অধিশাস্তা বিবেকের থেকে অনেকবেশী নীতিবান-এর নৈতিকতা অন্ধ ও আবেগ পূর্ণ।

ফ্রয়েড অদসে্র শক্তিকে কামপ্রেরণা বা Libido বলেছেন। অদস্ তার উদ্দেশ্যে চরিতার্থতার জন্য কাম প্রেরণার দ্বারা বর্হিজগতের বস্তুকে আকর্ষণ করে-সেই পদ্ধতিকে বলা হয়-object cathexis বা বিষয়াকর্ষণ। অদস্ অন্ধ নিরপেক্ষ বাস্তবতাকে বোঝে না। অহমশুধু ইঙ্গিত বস্তুকে কামনা করেই ক্ষান্ত থাকে। সামাজিক ও নৈতিক বাধাকে ডিঙিয়ে তাকে কেমন করে লাভ করা যাবে সে ভাবনা অহমের, অহমের কাজ কঠিন, একই সঙ্গে তিন মানবের কাজ করতে হয়—অহম, বহির্জগত ও অধিশাস্তা, আবার অহম ও অধিশাস্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির তাই বাধ্য হয়ে অহমকে বিচক্ষণ কূটনীতিবিদের মতো অসৎপথ অবলম্বন করতে হয়। তাকে অদসের অবচেতন ইচ্ছাগুলোকে সচেতন যুক্তিবাদ দিয়ে ঢাকতে হয় এবং সে অদসের অগ্রহণযোগ্য ইচ্ছাগুলোকে বাস্তবতার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে পরিবেশিত করে। অন্যদিকে অদসের তাগিদের দ্বারা প্রভাবিত হলে বাস্তবতা ও অধিশাস্তার কাছে তাকে যুক্তি খাড়া করে তাদের বোঝাতে হয়। সে যুক্তির ভিত্তি দৃঢ় হলে কোন সমস্যা নেই। আর তার ভিত্তি দুর্বল হলেই-বাস্তবতা, অধিশাস্তা তাকে ভয় দেখায়। বহির্জগত ভয় দেখালে তাকে বলা হয় বাস্তব উৎকণ্ঠা, অধিশাস্তা ভয় দেখালে তাকে বলে নৈতিক উৎকণ্ঠা।

'টহলদার' গল্পে রামদাসের জন্য শশীর বানানো একতারার সুর ও সৌন্দর্যে রামদাস (লোভ/অদস্) আকৃষ্ট হয়েছে। রামদাস শশীর হাত থেকে একতারটা নিয়ে সপ্রশংস স্বরে

Scanned with OKEN Scanner

বলেছে—"বা-বা বাঃ, এ যে চমৎকার হয়েছে রে, অ্যাঁ! বাঃ!" দ্বিতীয় বার বাউল একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছে। তারপর "যন্ত্রের তারে একটি আঘাত দিয়া ঝঙ্কার তুলিয়া বাউল বলিল, 'আওয়াজ ও হয়েছে ভারি মিঠে! বাঃ!" বোঝা যায় একতারার সৌন্দর্যে ও সুরে রামদাস বিস্ময়ান্বিত, মুগ্ধ। ফলে রামদাস তার লোভের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বাস্তবতা তার অনুকুল কেন না শশী তারই জন্য একতারাটা বানিয়ে এনেছে। সঙ্গত কারনেই বিবেকের (অধিশাস্তার) কাছে কোন্ যুক্তি খাড়া করা যায় সেই চিন্তা করছে—

> 'শশী কলিকা আনিয়া দেখিল, বাবাজী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া আছে। দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া শশী দেখিল, দেখিবার বস্তু কোথাও কিছু নাই"

এই চিন্তা ভাবনার ফলস্বরূপ টাকার বিনিময়ে একতারটি নিতে চাইছে রামা দাস। কেননা দান হিসাবে নিলে শশীর সেদিনের পাপের ভাগ নিতে হবে, ঘুষ নেওয়া হবে। কিন্তু টাকার বিনিময়ে শশী দিতে চায়নি। সে যখন একতারা নিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন আকাঙ্খিত বস্তু না পাওয়ার জন্য লোভের উদগ্রতা প্রকট হয়ে উঠছে—

> "রামদাস ও সেই নত মুখে বসিয়া ছিল। কলিকার তামাকটা নিঃশব্দে পুড়িতেছে। ক্ষীণ একটি ধোঁয়ার শিখা কুণ্ডলী পাকাইয়া উপরের দিকে উঠিতেছিল, কতক্ষণ এমনই নীরবে কাটিয়া গেল"

তাই দ্বিতীয়বার মনে মনে দ্বিতীয় যুক্তি খাড়া করেছে—"শশীবেচারী কষ্ট পাইবে"—এ জন্যই রামদাস একতারা গ্রহণ করেছে—"বাবাজী হাসিয়া বলিল, দিয়ে যা শশী, নিলাম ওটা আমি" কিন্তু বিবেকের কাছে-এযুক্তি গ্রহণ যোগ্য হয়নি বলেই রামদাসের মনে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে—

> "যন্ত্রটি লইয়া কিন্তু সমস্ত দিন রামদাসের মনে অশান্তির সীমা রহিলনা, বারবার মনে হইল, শশীকে ফিরাইয়া দিলেই সে ভালো করিত। হয়তো দুঃখ তাহার হইত, কিন্তু দুই-চারি দিনেই সে তাহা ভুলিয়া যাইত। কিন্তু তাহার পক্ষে এ যে ভয়ানক বস্তু। পাপ দেহে প্রবেশ করিলে কি আর রক্ষা আছে! এ যন্ত্রটি লওয়াতে যে শশীর সেদিনের পাপেরই অংশ লওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাহার কোন সন্দেহ নাই।"

স্বভাবতই শশীকে যন্ত্রটি ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবলেও মোহ ও লোভের ক্রমআধিক্যের ফলেই শশীকে আর ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি শশীর ম্লান মুখ স্মরণ করেই। কিন্তু সদাজাগ্রত বিবেক তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে— "এটুকু তাহার মিথ্যা অজুহাত, এ তাহার লোভ"। এই একতারাকে কেন্দ্র করেই লোভের ক্রমশাখায়িত বিস্তার ঘটেছে। যন্ত্রটিকে বার্ণিশ ঘষে চকচকে করে দেওয়ার জন্য ভূপতি মিস্ত্রীকে রামদাস অনুরোধ করেছে। ভূপতি বাবুদের বাড়ি থেকে বার্ণিশ চুরি করে এনেছে-এ কথা শুনে স্বভাবতই রামদাসের বিবেক এতে সায় দেয় নি—"বাউলের মুখ বির্বণ হইয়া গেল সে চমকিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল, চুরি করে!" কিন্তু ভূপতি মিস্ত্রীর যুক্তিতে রামদাসের চমক ও বিবর্ণতা কেটে গেছে। তার যুক্তি রামদাস 'নেহাত অল্প প্রাণী'—'ইয়েকে আবার চুরি করা বলে নাকি"।

Scanned with OKEN Scanner

"ইয়ের দাম আর কত—বড়জোর এক পয়সা। একটা পয়সা আবার চুরি করা হয় নাকি? আমরা তো তাহলে ডাকাত! এই দেখ, সামান্য জিনিস, বড় লোকের পড়ে নষ্ট হবে—বুঝলে কিনা-কিন্তু চাইতে যাও দেখি, কখনও বেটারা দেবে না, সে নেব না তো কি?"

ভূপতি মিস্ত্রীর এই যুক্তি রামদাসের লোভের সপক্ষে। অপর দিকে তার মানস পরিবর্তনে যথেষ্ট গুরুত্ব পূর্ণভূমিকা পালন করেছে। তাই এক তারাটি শশীকে "ফিরাইয়া দেওয়া এখন আর অসম্ভব" এত দিন যা দেব দেব করে ও ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি এখন তা ফিরিয়ে দেওয়া 'অসম্ভব'-রাম দাসের মন এই দৃঢ়তায় সংকল্পবদ্ধ। একসময় শশীর চুরি চাপা দিতে, তার পরিবারের কথা ভেবে রামদাস বাধ্য হয়ে একতারা নিয়েছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সরাসরি চুরি করা বার্নিশ তার অধিকারে এল। শুধু তাই নয় ভূপতি মিস্ত্রীর যুক্তি ও রামদাসের মনে প্রাধান্য বিস্তার করলো— প্রথমতঃ এক পয়সা নিলে সেটাকে চুরি বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ বড়লোকের সামান্য জিনিস পড়ে নষ্ট হয় অথচ চাইলেও যেহেতু দেয়না সেই কারণে তা চুরি করলে তার মধ্যে কোন দোষ নেই।

ঠিক এরপরই গল্পে দেখবো—"সহসা বাউলকে যেন কেমন ভুলে পাইয়া বসিল' প্রত্যুষের বহু পূর্বে এখন তার ঘুম ভেঙে যায়। সে টহল দিতে বেরিয়ে পড়ে, ভ্রম বুঝতে পারলেও আর দেবী মন্দিরে গিয়ে অপেক্ষা করেনা কেন না-"সে যেন তাহার ভালো লাগে না" আমাদের কোন কাজে কেন ভুল ভ্রম হয় এ প্রশ্নের উত্তরে ফ্রয়েড বলেন—

> "যে কাজে আমরা ভুল করি তার পেছনে অবশ্যই দুটি ভিন্ন অর্থ এবং উদ্দেশ্য থাকবে এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিতে চেষ্টা করবে। ভুলের মধ্যে আছে এই দুই পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্যের মীমাংসার চেষ্টা। উভয় উদ্দেশ্যই অংশত সফল এবং অংশত ব্যর্থহয় এই দুই প্রকার উদ্দেশ্যের একটি হল সচেতন মনের আর অপরটি হল নির্জ্ঞান মনের"[৫]

রামদাসের মধ্যে এই সচেতন আর নির্জ্ঞান মনের পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বই ক্রিয়াশীল—

"নির্জন গাঢ় রাত্রির একটা মোহ যেন তাহাকে আকর্ষণ করে। এক একবার অকস্মাৎ কেমন চমক ভাঙিয়া যায়। তখন সে গাঢ় রাত্রির অন্ধকারে একটা গলির দিকে অগ্রসর হইয়া আপন মনে হাসিতে হাসিতে বলে, এবার একবার শশীর দেখা পেলে হয়, এবার কিন্তু আর ক্ষমা করব না"

তার নির্জ্ঞান মনের যখন প্রাধান্য তখন নির্জন রাত্রির মোহ তাকে আকর্ষণ করে। রাত্রির অনুরূপ অনুভবের কথা ধানচোর শশী ও ব্যক্ত করেছিল চুরির স্বভাব প্রসঙ্গে—"থম থমে নিষুত রাতে চেতন হলেই কে যেন ঘাড়ে ধরে টেনে বার করে নিয়ে যায়।" রামদাসের যখন চমক ভেঙে যায়-যখন সজ্ঞান মন অর্থাৎ টহলদারি সত্তারই প্রাধান্য ঘটে-তখন সেই সত্তা বলে-এবার শশীর চুরি ধরা পড়লে আর তাকে ক্ষমা করবে না।

চাটুজ্জেদের খিড়কি ঘাটে পা ধোয়ার জন্য নেমে সে গেলাসের সন্ধান করেছে,—

'ধুইতে ধুইতে তাহার কি খেয়াল হইল কে জানে, ঘাটময় সে পা বুলাইয়া ফিরিল। হঠাৎ হেঁট হইয়া হাতে করিয়া তুলিল একটা মাটির ভাঁড়। ঘৃনায় বিরক্তিতে সেটা কেলিয়া দিয়া

তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িল। আপন মনেই সে বলিল, ধেৎ,-আমি বলি ঘাটে কে গেলাস-টেলাস-ধ্যেৎ"

লক্ষণীয় রামদাসের দুর্নিবার লোভ প্রবৃত্তির সপক্ষে ভূপতি মিস্ত্রীর যুক্তি রামদাসের মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল থেকেছে। প্রথমত চাটুজ্জেরা বড়লোক উপরন্তু গেলাস 'সামান্য' জিনিস। টহল দেওয়ার পথে বাঁড়ুজ্জেদের বৈঠক খানার দরজা খোলা দেখে রামদাসের আদিম প্রবৃত্তি লোভ জেগে উঠেছে। তা না হলে তার মধ্যে এরূপ প্রতিক্রিয়া হত না—

"বাউল থমকিয়া দাঁড়াইল। একি, বৈঠক খানার দরজা ও যে খোলা হাঁ হাঁ করিতেছে। গোটা দুই সিড়ি উপরে উঠিয়া বাউল বুঝিল, রাত্রে এখানে খাওয়া-দাওয়া আমোদ-প্রমোদ হইয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সে নামিয়া আসিল। অকস্মাৎ মনে হইল, বাবুদের মজলিসে একটা আধটা বিড়ি ও পড়িয়া নাই?"

দরজা খোলা দেখে বাউলের থমকে দাঁড়ানো, বিস্ময় (একি), 'খোলা দরজা হাঁ হাঁ করা, প্রভৃতি মানস প্রতিক্রিয়া', সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাওয়া চারদিকে তাকানো', আবার বিড়ির সন্ধানে সিড়ি দিয়ে উঠে যাওয়া প্রভৃতি ভাবের মধ্যে আদিম প্রবৃত্তির লীলাই ক্রিয়াশীল। এখানেও সেই নির্জন রাত্রির মোহাচ্ছন্নতা। আর বিড়ি সে ও তো সামান্য জিনিস। ফ্রয়েড বলেন-অদসের মধ্যে কোন অনুভূতি একবার প্রবেশ করলে অদস যতদিন থাকবে সেই অনুভূতিও ততদিন থাকবে। কেবল শশীর নির্জন রাত্রির অনুভব ভূপতিমিস্ত্রীর যুক্তির ফলেই নয় রামদাসের পরের জিনিস কুড়িয়ে নেওয়ার মানসিকতা অনেক আগে থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল। রামদাসের সারাদিনের কাজকর্মের মধ্যে একটি হল—দরজীর দোকানের ছিটের টুকরা কুড়াইয়া আনিয়া আলখাল্লার গায়ে বসাইয়া সেটিকে বিচিত্রিত করিয়া' তোলা। বাবুদের বৈটকখানায় বিড়ির সন্ধানও পূর্ব মানসিক অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি। তারপর বেহালার বাক্স দেখতে পেয়ে বেহালাটা হাতে নেওয়া মাত্রই তার বার্ণিশ 'চকচক' করে উঠেছে—যে চকমকে প্রতিফলনটার অনুভব তার একতারাতেই আছে। ফলে বেহালাটা আত্মস্মাৎ করার লোভ সংবরণ করার শক্তি রামদাসের থাকলো না সে বেহালাটা চুরি করলো।

কিন্তু বিবেকের (অধিশাস্তা) কাছে রামদাসের এই কার্য সমর্থিত হয়নি। তাই বিবেকের শাসনে তার মধ্যে নৈতিক উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। বিবেকের মুখোমুখি হয়ে-'রামদাস ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল" সে একটা ছায়ার মুখোমুখি হয়েছে—"পাশের একটা গলির মধ্যে সে মোড় ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে কে তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, বাউল আবার চমকিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—কে? কেহ উত্তর দিলনা। রামদাস দেখিল, এ তাহারই সেই ছায়া" এই ছায়া আসলে রামদাসের স্পর্যিত বিবেক। এর হাত থেকে তার কোথাও মুক্তি নেই-সে যে গলি দিয়েই ছুটুক।

রামদাসের এই অধঃপতনে লোভের তাগিদেই শুধু নয় বর্হিজগৎ বাস্তবতাও এই অধঃপতনকে ত্বরান্বিত করতে প্রতিবন্ধকতা তো তৈরী করেনি উপরন্তু সহযোগিতা করেছে। তার লোভ নিবৃত্তির উপায় করে দিয়েছে-শশী একতারা বিনামূল্য দিয়ে আর ভূপতি মিস্ত্রী চকচকে করেছে চুরি করা বার্ণিশে। অন্য দিকে শশী প্রমাণ করেছে সে একা চুরি করে না-ধর্মপ্রাণ বলে পরিচিত গোসাঁইও ধান চুরি করে— তার সর্বশেষ কথা—"ওগো মাছ খায়

Scanned with OKEN Scanner

সব পাখিতেই, নাম হয় কেবল্ মাছরাঙার'' অন্যদিকে ভূপতি মিস্ত্রীর যুক্তি ও তার সর্বশেষ কথা—'আমরা তো তা হলে ডাকাত' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-'মাখন-চোর'- তাহলে বর্হিজগৎ বাস্তবতায় আমরা সবাই চোর—এ প্রমাণিত সত্য রামদাসের মানস পরিবর্তনে সহায়তা করেছে।

নামে কিবা এসে যায়-ব্যক্তিনামে হয়তো কিছু এসে যায় না কিন্তু সাহিত্যের নামকরণে অনেক কিছুই এসে যায়। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠার আগেই তার নামকরণ হয়ে যায় তাই কানা ছেলে পদ্মলোচন হতে পারে, 'বোবা মেয়ের নাম হতেই পারে সুভাষিণী, কিন্তু সাহিত্যের নামকরণ তার বিশিষ্টতা ও পরিচয় জ্ঞাপক। সাহিত্যের নামকরণ সাধারণ তিন দিক থেকে করা হয়ে থাকে—(ক) চরিত্রকেন্দ্রিক নামকরণ, (খ) কাহিনী বা ঘটনা কেন্দ্রিক নামকরণ (গ) ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ। 'টহলদার' গল্পের নামকরণ চরিত্র কেন্দ্রিক কেননা মূল চরিত্র রামদাস বাউলকে কেন্দ্র করেই গল্প গড়ে উঠেছে। টহলদারিই যাদের বৃত্তি বা জীবিকা তাদের কে টহলদার বলে, এখানে টহলদার হল রামদাস বাউল। টহলদার গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প। টহলদার যেমন অনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত ব্যক্তিদের ধরার জন্য পাহারা দেন তেমনি অদম যাতে অনৈতিক ইচ্ছাগুলোকে খেয়াল খুশি মতো চরিতার্থ করতে না পারে সেজন্য অহম ঘুমের মধ্যে ও প্রহরী রেখে দেয়। সর্বোপরি আমাদের বিবেক সদা জাগ্রত প্রহরীর মতো ব্যক্তিমানসের কার্যকলাপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন-অনৈতিক কিছু ঘটলেই বিবেক (অধিশাস্তা) শাস্তি দিয়ে থাকে।

২

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে উপস্থাপন সমস্যাই প্রধান। ছোটগল্পের গঠন ও বিন্যাসের বিশ্লেষণে সাধারণত তিনপ্রকার বৃত্তগঠন প্রত্যক্ষগোচর হয় 'stair-step construction বা সোপানারোহ গঠন', একে পিরামিড গঠনও বলা যেতে পারে। 'Rocket construction বা চকিতোন্নত গঠন', Circular 'construction' বা ঘূর্ণরেখ গঠন' আর এক প্রকার গল্পগঠন- 'plot less plot construction বা বৃত্তহীন বৃত্তগঠন'—যা অবশ্য তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত নয়, তা অনেক পরবর্তী কালের। (১৯৬৬ সালের মার্চমাসে প্রকাশিত শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের মুখপত্র 'এই দশক' সেখানে একটি প্রতীতি কে সামনে রেখে আপাত গ্রন্থনহীন পরিণতিহীন কাহিনীর বিস্তার থাকে) তারাশঙ্করের 'টহলদার' যে মনস্তাত্ত্বিক গল্প তা আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি। যিনি মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে গল্পের বিষয় করে থাকেন বাধ্যবাধকতা না থাকলেও তিনি সাধারণত 'circular construction' কেই বেশী প্রাধান্য দেন। সেই দিক থেকে বিচার করলে 'টহলদার' মনস্তাত্ত্বিক গল্প হলেও তার বৃত্তগঠন কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক নয়। এই গল্পে তারাশঙ্কর stair-step construction কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আসলে সোপানারোহ বৃত্ত গঠনে গল্পকারের স্বাধীনতা অনেক বেশী—গল্পের গতি নিয়ন্ত্রিত করার জন্য গল্পকার প্রয়োজনীয় ঘটনার সংস্থান করতে পারেন ফলে গল্পকে সংকটের পরিণতি বিন্দুতে উর্ত্তীণ করার রাশ গল্পকারের হাতে থাকে। গল্পের ঘটনা সংস্থানের দিকে তাকালে দেখা যায়-ধানের বস্তা নিয়ে রামদাসের কাছে শশীর ধরা পড়ে যাওয়াকে যদি গল্পের প্রথম ঘটনা ধরা যায় তাহলে গল্পের ধারাবাহিক অপরাপর ঘটনা গুলি হল-শশীর বানানো একতারা রামদাসের

Scanned with OKEN Scanner

তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িল। আপন মনেই সে বলিল, ধেৎ,-আমি বলি ঘাটে কে গেলাস-টেলাস-ধ্যেৎ"

লক্ষণীয় রামদাসের দুর্নিবার লোভ প্রবৃত্তির সপক্ষে ভূপতি মিস্ত্রীর যুক্তি রামদাসের মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল থেকেছে। প্রথমত চাটুজ্জেরা বড়লোক উপরন্তু গেলাস 'সামান্য' জিনিস। টহল দেওয়ার পথে বাঁড়ুজ্জেদের বৈঠক খানার দরজা খোলা দেখে রামদাসের আদিম প্রবৃত্তি লোভ জেগে উঠেছে। তা না হলে তার মধ্যে এরূপ প্রতিক্রিয়া হত না—

"বাউল থমকিয়া দাঁড়াইল। একি, বৈঠক খানার দরজা ও যে খোলা হাঁ হাঁ করিতেছে। গোটা দুই সিড়ি উপরে উঠিয়া বাউল বুঝিল, রাত্রে এখানে খাওয়া-দাওয়া আমোদ-প্রমোদ হইয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সে নামিয়া আসিল। অকস্মাৎ মনে হইল, বাবুদের মজলিসে একটা আধটা বিড়ি ও পড়িয়া নাই?"

দরজা খোলা দেখে বাউলের থমকে দাঁড়ানো, বিস্ময় (একি), 'খোলা দরজা হাঁ হাঁ করা, প্রভৃতি মানস প্রতিক্রিয়া', সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাওয়া চারদিকে তাকানো', আবার বিড়ির সন্ধানে সিড়ি দিয়ে উঠে যাওয়া প্রভৃতি ভাবের মধ্যে আদিম প্রবৃত্তির লীলাই ক্রিয়াশীল। এখানেও সেই নির্জন রাত্রির মোহাচ্ছন্নতা। আর বিড়ি সে ও তো সামান্য জিনিস। ফ্রয়েড বলেন-অদসের মধ্যে কোন অনুভূতি একবার প্রবেশ করলে অদস যতদিন থাকবে সেই অনুভূতিও ততদিন থাকবে। কেবল শশীর নির্জন রাত্রির অনুভব ভূপতিমিস্ত্রীর যুক্তির ফলেই নয় রামদাসের পরের জিনিস কুড়িয়ে নেওয়ার মানসিকতা অনেক আগে থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল। রামদাসের সারাদিনের কাজকর্মের মধ্যে একটি হল—দরজীর দোকানের ছিটের টুকরা কুড়াইয়া আনিয়া আলখাল্লার গায়ে বসাইয়া সেটিকে বিচিত্রিত করিয়া' তোলা। বাবুদের বৈটকখানায় বিড়ির সন্ধানও পূর্ব মানসিক অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি। তারপর বেহালার বাক্স দেখতে পেয়ে বেহালাটা হাতে নেওয়া মাত্রই তার বার্ণিশ 'চকচক' করে উঠেছে—যে চকমকে প্রতিফলনটার অনুভব তার একতারাতেই আছে। ফলে বেহালাটা আত্মস্মাৎ করার লোভ সংবরণ করার শক্তি রামদাসের থাকলো না সে বেহালাটা চুরি করলো।

কিন্তু বিবেকের (অধিশাস্তা) কাছে রামদাসের এই কার্য সমর্থিত হয়নি। তাই বিবেকের শাসনে তার মধ্যে নৈতিক উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। বিবেকের মুখোমুখি হয়ে-'রামদাস ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল" সে একটা ছায়ার মুখোমুখি হয়েছে—"পাশের একটা গলির মধ্যে সে মোড় ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে কে তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, বাউল আবার চমকিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—কে? কেহ উত্তর দিলনা। রামদাস দেখিল, এ তাহারই সেই ছায়া" এই ছায়া আসলে রামদাসের স্পর্ষিত বিবেক। এর হাত থেকে তার কোথাও মুক্তি নেই-সে যে গলি দিয়েই ছুটুক।

রামদাসের এই অধঃপতনে লোভের তাগিদেই শুধু নয় বর্হিজগৎ বাস্তবতাও এই অধঃপতনকে ত্বরান্বিত করতে প্রতিবন্ধকতা তো তৈরী করেনি উপরন্তু সহযোগিতা করেছে। তার লোভ নিবৃত্তির উপায় করে দিয়েছে-শশী একতারা বিনামূল্য দিয়ে আর ভূপতি মিস্ত্রী চকচকে করেছে চুরি করা বার্ণিশে। অন্য দিকে শশী প্রমাণ করেছে সে একা চুরি করে না-ধর্মপ্রাণ বলে পরিচিত গোসাঁইও ধান চুরি করে— তার সর্বশেষ কথা—"ওগো মাছ খায়

Scanned with OKEN Scanner

তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িল। আপন মনেই সে বলিল, ধেৎ,-আমি বলি ঘাটে কে গেলাস-টেলাস-ধ্যেৎ"

লক্ষণীয় রামদাসের দুর্নিবার লোভ প্রবৃত্তির সপক্ষে ভূপতি মিস্ত্রীর যুক্তি রামদাসের মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল থেকেছে। প্রথমত চাটুজ্জেরা বড়লোক উপরন্তু গেলাস 'সামান্য' জিনিস। টহল দেওয়ার পথে বাঁড়ুজ্জেদের বৈঠক খানার দরজা খোলা দেখে রামদাসের আদিম প্রবৃত্তি লোভ জেগে উঠেছে। তা না হলে তার মধ্যে এরূপ প্রতিক্রিয়া হত না—

"বাউল থমকিয়া দাঁড়াইল। একি, বৈঠক খানার দরজা ও যে খোলা হাঁ হাঁ করিতেছে। গোটা দুই সিড়ি উপরে উঠিয়া বাউল বুঝিল, রাত্রে এখানে খাওয়া-দাওয়া আমোদ-প্রমোদ হইয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সে নামিয়া আসিল। অকস্মাৎ মনে হইল, বাবুদের মজলিসে একটা আধটা বিড়ি ও পড়িয়া নাই?"

দরজা খোলা দেখে বাউলের থমকে দাঁড়ানো, বিস্ময় (একি), 'খোলা দরজা হাঁ হাঁ করা, প্রভৃতি মানস প্রতিক্রিয়া', সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাওয়া চারদিকে তাকানো', আবার বিড়ির সন্ধানে সিড়ি দিয়ে উঠে যাওয়া প্রভৃতি ভাবের মধ্যে আদিম প্রবৃত্তির লীলাই ক্রিয়াশীল। এখানেও সেই নির্জন রাত্রির মোহাচ্ছন্নতা। আর বিড়ি সে ও তো সামান্য জিনিস। ফ্রয়েড বলেন-অদসের মধ্যে কোন অনুভূতি একবার প্রবেশ করলে অদস যতদিন থাকবে সেই অনুভূতিও ততদিন থাকবে। কেবল শশীর নির্জন রাত্রির অনুভব ভূপতিমিস্ত্রীর যুক্তির ফলেই নয় রামদাসের পরের জিনিস কুড়িয়ে নেওয়ার মানসিকতা অনেক আগে থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল। রামদাসের সারাদিনের কাজকর্মের মধ্যে একটি হল—দরজীর দোকানের ছিটের টুকরা কুড়াইয়া আনিয়া আলখাল্লার গায়ে বসাইয়া সেটিকে বিচিত্রিত করিয়া' তোলা। বাবুদের বৈটকখানায় বিড়ির সন্ধানও পূর্ব মানসিক অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি। তারপর বেহালার বাক্স দেখতে পেয়ে বেহালাটা হাতে নেওয়া মাত্রই তার বার্ণিশ 'চকচক' করে উঠেছে—যে চকমকে প্রতিফলনটার অনুভব তার একতারাতেই আছে। ফলে বেহালাটা আত্মসাৎ করার লোভ সংবরণ করার শক্তি রামদাসের থাকলো না সে বেহালাটা চুরি করলো।

কিন্তু বিবেকের (অধিশাস্তা) কাছে রামদাসের এই কার্য সমর্থিত হয়নি। তাই বিবেকের শাসনে তার মধ্যে নৈতিক উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। বিবেকের মুখোমুখি হয়ে-'রামদাস ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল" সে একটা ছায়ার মুখোমুখি হয়েছে—"পাশের একটা গলির মধ্যে সে মোড় ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে কে তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, বাউল আবার চমকিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—কে? কেহ উত্তর দিলনা। রামদাস দেখিল, এ তাহারই সেই ছায়া" এই ছায়া আসলে রামদাসের স্পর্যিত বিবেক। এর হাত থেকে তার কোথাও মুক্তি নেই-সে যে গলি দিয়েই ছুটুক।

রামদাসের এই অধঃপতনে লোভের তাগিদেই শুধু নয় বর্হিজগৎ বাস্তবতাও এই অধঃপতনকে ত্বরান্বিত করতে প্রতিবন্ধকতা তো তৈরী করেনি উপরন্তু সহযোগিতা করেছে। তার লোভ নিবৃত্তির উপায় করে দিয়েছে-শশী একতারা বিনামূল্য দিয়ে আর ভূপতি মিস্ত্রী চকচকে করেছে চুরি করা বার্ণিশে। অন্য দিকে শশী প্রমাণ করেছে সে একা চুরি করে না-ধর্মপ্রাণ বলে পরিচিত গোসাঁইও ধান চুরি করে— তার সর্বশেষ কথা—"ওগো মাছ খায়

সব পাখিতেই, নাম হয় কেবল মাছরাঙার'' অন্যদিকে ভূপতি মিস্ত্রীর যুক্তি ও তার সর্বশেষ কথা—'আমরা তো তা হলে ডাকাত' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-'মাখন-চোর'- তাহলে বর্হিজগৎ বাস্তবতায় আমরা সবাই চোর—এ প্রমাণিত সত্য রামদাসের মানস পরিবর্তনে সহায়তা করেছে।

নামে কিবা এসে যায়-ব্যক্তিনামে হয়তো কিছু এসে যায় না কিন্তু সাহিত্যের নামকরণে অনেক কিছুই এসে যায়। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠার আগেই তার নামকরণ হয়ে যায় তাই কানা ছেলে পদ্মলোচন হতে পারে, 'বোবা মেয়ের নাম হতেই পারে সুভাষিণী, কিন্তু সাহিত্যের নামকরণ তার বিশিষ্টতা ও পরিচয় জ্ঞাপক। সাহিত্যের নামকরণ সাধারণ তিন দিক থেকে করা হয়ে থাকে—(ক) চরিত্রকেন্দ্রিক নামকরণ, (খ) কাহিনী বা ঘটনা কেন্দ্রিক নামকরণ (গ) ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ। 'টহলদার' গল্পের নামকরণ চরিত্র কেন্দ্রিক কেননা মূল চরিত্র রামদাস বাউলকে কেন্দ্র করেই গল্প গড়ে উঠেছে। টহলদারিই যাদের বৃত্তি বা জীবিকা তাদের কে টহলদার বলে, এখানে টহলদার হল রামদাস বাউল। টহলদার গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প। টহলদার যেমন অনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত ব্যক্তিদের ধরার জন্য পাহারা দেন তেমনি অদম যাতে অনৈতিক ইচ্ছাগুলোকে খেয়াল খুশি মতো চরিতার্থ করতে না পারে সেজন্য অহম ঘুমের মধ্যে ও প্রহরী রেখে দেয়। সর্বোপরি আমাদের বিবেক সদা জাগ্রত প্রহরীর মতো ব্যক্তিমানসের কার্যকলাপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন-অনৈতিক কিছু ঘটলেই বিবেক (অধিশাস্তা) শাস্তি দিয়ে থাকে।

২

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে উপস্থাপন সমস্যাই প্রধান। ছোটগল্পের গঠন ও বিন্যাসের বিশ্লেষণে সাধারণত তিনপ্রকার বৃত্তগঠন প্রত্যক্ষগোচর হয় 'stair-step construction বা সোপানারোহ গঠন', একে পিরামিড গঠনও বলা যেতে পারে। 'Rocket construction বা চকিতোন্নত গঠন', Circular 'construction' বা ঘূর্ণরেখ গঠন' আর এক প্রকার গল্পগঠন- 'plot less plot construction বা বৃত্তহীন বৃত্তগঠন'—যা অবশ্য তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত নয়, তা অনেক পরবর্তী কালের। (১৯৬৬ সালের মার্চমাসে প্রকাশিত শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের মুখপত্র 'এই দশক' সেখানে একটি প্রতীতি কে সামনে রেখে আপাত গ্রন্থনহীন পরিণতিহীন কাহিনীর বিস্তার থাকে) তারাশঙ্করের 'টহলদার' যে মনস্তাত্ত্বিক গল্প তা আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি। যিনি মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে গল্পের বিষয় করে থাকেন বাধ্যবাধকতা না থাকলেও তিনি সাধারণত 'circular construction' কেই বেশী প্রাধান্য দেন। সেই দিক থেকে বিচার করলে 'টহলদার' মনস্তাত্ত্বিক গল্প হলেও তার বৃত্তগঠন কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক নয়। এই গল্পে তারাশঙ্কর stair-step construction কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আসলে সোপানারোহ বৃত্ত গঠনে গল্পকারের স্বাধীনতা অনেক বেশী—গল্পের গতি নিয়ন্ত্রিত করার জন্য গল্পকার প্রয়োজনীয় ঘটনার সংস্থান করতে পারেন ফলে গল্পকে সংকটের পরিণতি বিন্দুতে উর্ত্তীণ করার রাশ গল্পকারের হাতে থাকে। গল্পের ঘটনা সংস্থানের দিকে তাকালে দেখা যায়-ধানের বস্তা নিয়ে রামদাসের কাছে শশীর ধরা পড়ে যাওয়াকে যদি গল্পের প্রথম ঘটনা ধরা যায় তাহলে গল্পের ধারাবাহিক অপরাপর ঘটনা গুলি হল-শশীর বানানো একতারা রামদাসের

গ্রহণ করা, বাবুদের বাড়ি থেকে চুরিকরা বার্ণিশ দিয়ে ভূ-পতি মিস্ত্রীর রামদাসের একতারাকে চকচকে করে দেওয়া, চাটুজ্জেদের খিড়কি ঘাটে পা চালিয়ে রামদাসের গেলাসের সন্ধান করা, গল্পের পঞ্চম ঘটনা হল-মুখুজ্জেদের বৈঠকখানা থেকে রামদাসের বেহালা চুরি করা। এই পাঁচটি ঘটনা পরম্পরায় টহলদার গল্পকে গল্পকার সংকটের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দিয়েছেন—যেখানে রামদাস আপনার ছায়ার, আপনার ভয়ের মুখোমুখি হয়েছেন; রামদাসের অহং; এবং অধিশাস্তা পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে আর রামদাস গলি রাস্তা ধরে ছুটে বেড়িয়েছে। এই ছায়ার হাত থেকে তার মুক্তি নেই।

ঘটনা-চরিত্র-প্রতীতির সমন্বয়েই ছোটগল্প সার্থকতা লাভ করে। যেখানে এদের আপেক্ষিক প্রাধান্য থাকে, সেই আপেক্ষিক প্রাধান্যের ভিত্তিতেই হয়তো ছোটগল্পের বিভাজন করা চলে ঘটনামুখ্য (story of incident) চরিত্র মুখ্য (story of character) প্রতীতি মুখ্য (story of impression) 'The Philosophy of short story-1901' গ্রন্থে Brander Mathews বলেছিলেন " A true short story differs from the Novel chiefly in its essential unity of impression" এই 'unity of impression' বা একক প্রতীতিই ছোট গল্পের প্রাণ। প্রতীতি কে ফুটিয়ে তুলতে হলে গল্পকারকে ঘটনা ও চরিত্রকে অবলম্বন করতেই হবে। Single character, event and emotion' (Brander Mathews) —তাই গল্পে এ তিনটির মধ্যে যারই আপেক্ষিক প্রাধান্য থাক্‌ক না কেন একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির আলোচনা অবান্তর। আর সেখানে এ তিনের সুমিত সমন্বয় ঘটে সেখানে ছোট গল্প সোনার সোহাগা। এ প্রসঙ্গে-'শিল্পরূপ তারাশঙ্করের ছোটগল্প' প্রবন্ধে হীরেন চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—

> "গল্পযখন প্রায় অলৌকিক রসসিদ্ধি লাভ করে তখন এই বিভাগ অর্থহীন হয়ে পড়ে-দেখা যায় গল্পে একই সঙ্গে চরিত্র ঘটনা এবং প্রতীতি এক সুমিত সমন্বয় লাভ করেছে-সেখানে বিভাজন-রেখা টানাই প্রায় অসাধ্য ব্যাপার"[৬]

সমালোচক হীরেন চট্টোপাধ্যায় গল্পটিকে চরিত্রমুখ্য ছোটগল্প হিসাবেই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন—" চরিত্র প্রধান এই গল্পের প্রধান চরিত্র হল গ্রামের টহলদার রামদাস বাউল"। তারাশঙ্করের 'গল্পগুচ্ছের' সম্পাদক সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্যও 'টহলদার' গল্পের চরিত্র মুখ্যতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন—"পুরুষানুক্রমে টহলদারিই যাদের বৃত্তি তাদেরই পদস্খলিত বংশধর রামদাস বাউল" গল্পের নাম টহলদার-টহলদারের নাম রামদাস বাউল। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রামদাস, রামদাসের পদস্খলন ও তার কারণে বিবেকের দংশনে গল্পের সমাপ্তি। কিন্তু অন্যদিকে এ গল্পের প্রতীতি ও ঘটনার পাল্লা ও কম ভারি নয়। রামদাস বাউলকে কেন্দ্রে রেখেই শশী; ভূষতি মিস্ত্রী যতীপন আবর্তিত হয়েছে। শশীর সঙ্গে রামদাসের কথোপকথনে গোসাঁই বাবাজির কথা এসেছে-কিন্তু কোন প্রসঙ্গে? চুরি প্রসঙ্গে। এ গল্পের প্রতীতি হল-চুরি করা। সে চুরি কখনো লোভ বা মোহ থেকে। আবার কখনো প্রয়োজনে, কখনো অপ্রয়োজনে—স্বভাবের বশবর্তী হয়ে। রামদাসের সঙ্গে শশীর কথোপকথনে শশীর একটি তাৎপর্য পূর্ণ উক্তি এই প্রতীতিকে প্রকাশ করেছে-"ওগো মাছ খায় সব পাখিতেই, নাম হয় কেবল মাছরাঙার "শশী কি বলতে চাইছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবাই চোর? এই প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যই সব চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে। শশী

Scanned with OKEN Scanner

চুরি করে থাকে স্বভাবে-'স্বভাবে হয়কি জান, থমথমে নিযুত রাতে চেতন হলেই কে যেন ঘাড়ে ধরে টেনে বার করে নিয়ে যায় কি। কিন্তু সে আর কদিন? অভাবেই তাকে চুরি করতে হয় বেশি। কারণ যেখানে যা কিছু চুরি হয় সবই যায় শশীর নামে। তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায় তার পর উকিল-মোক্তার, মামলা খরচ "-এ আসে কোথা থেকে বল দেখি? ভিক্ষে করলে জোটে না মজুর খেটে ও কুলোয় না" অর্থাৎ চুরিই শশীর নিয়তি, চুরিই শশীর ভূষণ-চাঁদের কলঙ্কের মতো।

ভূপতি মিস্ত্রী সেও চুরি করে থাকে। বাবুদের বাড়ি থেকে চুরি করা বার্ণিশ এনে বাউলের একতারায় লাগিয়ে দেয়—এ চুরির জন্য তার মধ্যে অপরাধবোধ নেই। চুরি করার কথা শুনে রামদাস চমকে উঠে তার মুখ বির্বণ হলে ভূপতির যুক্তি—'ইয়ের দাম আর কত বড়-জোর একটা পয়সা। একটা পয়সা, আবার চুরি করা হয় নাকি? আমরা তো তাহলে ডাকাত!" বোঝা যায়, ভূপতি বাবুদের বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে নানা রকম জিনিস চুরি করে থাকে। রামদাস বাবাজী বুঝেছে যে এ চাকলায় শশী ছাড়া ও আরো অনেক চোর আছে—সে কথাটা শশী আগেই রামদাসকে বোঝাতে চেয়েছিল—"কিন্তু বল দেখি বাবাজী, চোর কি এ চাকলায় শশে ছাড়া কেই নাই?" তাছাড়া ভূপতির 'আমরা' সর্বনাম পদের প্রয়োগও তাৎপর্যপূর্ণ। 'আমরা' 'আমি-তুমি ও সে'—সবাই চোর; চুরির পেছনে তার যুক্তি ও অকাট্য—"এই দেখ সামান্য জিনিস, বড়লোকের পড়ে নষ্ট হবে-বুঝলে কিনা-কিন্তু চাইতে যাও দেখি, কখনো বেটারা দেবেনা। সে নেব না তো কি?"—এযেন আফির্মখার কমলাকান্তের যুক্তি, বিড়ালের যুক্তি'। আর ধর্মপ্রাণ মানুষগুলো? শশী মারফত আমরা জেনেছি, রামদাস জেনেছে—শশীর সহযোগিতায় মা চণ্ডীর ধানের গোলা 'ফাঁক' করে গোসাঁই বাবাজী গাড়িতে চাপিয়ে আমুদপুরে বিক্রি করে এসেছে। গ্রামের পথে টহল দিতে গিয়ে রামদাস বাউলের করতালের ঝঙ্কারে, তার মোটাভরাট গলার সুরে যে গান বেজে উঠেছে তা-ও গল্পের প্রতীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা সংযোজন করে—

'নিশি হল ভোর
উঠরে মাখন-চোর।
বলাই রতন ডা-কে, নিশি হল ভো-র"

লক্ষণীয় বিষয় মাখন ও চোরের মাঝখানে হাইফেন '-' ব্যবহার বোঝায় শুধু মাখন নয় পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই চুরি করা। আর রামদাস বাউল, সে তো শেষ পর্যন্ত মুখুজ্জেদের বৈঠকখানা থেকে বেহালা চুরি করে বসেছে। 'তাহলে-শশী চোর, ভূপতি চোর' গোসাঁই চোর, রামদাস বাবাজী চোর এমনকি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও চোর—এ পৃথিবীতে আমরা সবাই চোর। এই প্রতীতির এককতাই গল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত।

'টহলদার' গল্পের ঘটনা সংস্থানের কথা গল্পের বৃত্তগঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে, পুনরুক্ত দোষে দুষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় এখানে তা উল্লেখ করছিনা। হীরেন চট্টোপাধ্যায় একে চরিত্র মুখ্য ছোটগল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও রামদাসের কার্যকলাপ তার দ্বন্দ্ব এবং গল্প সমাপ্তিতে তার ট্রাজেডির কথা স্মরণে রেখেই বলতে চাইছি এ গল্পে ঘটনা চরিত্র ও প্রতীতির এক 'সুমিত সমন্বয় লাভ করে' গল্পকে 'এক অলৌকিক রস সিদ্ধির' স্তরে উর্ত্তীণ

Scanned with OKEN Scanner

করে দিয়েছে—যা ছোট গল্পের শিল্প সার্থকতার গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যিক শর্ত।

ছোটগল্প যেহেতু জীবনের খণ্ডাংশের প্রতিবিম্বন সেইহেতু তার সমাপ্তি শেষ কথা বলবে না সেই প্রেক্ষণবিন্দু থেকে রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরীর' 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটগল্পের সমাপ্তি প্রসঙ্গে বলেছিলেন "অন্তরে অতৃপ্তিরবে/ সাঙ্গ করি মনে হবে/ শেষ হয়ে হইলনা শেষ"। আবার অনেকে বলেন, শিল্প সৃষ্টির শেষে পাঠক যদি তৃপ্তি না পায় তবে তাকে কেমন করে শিল্পসৃষ্টি বলা যাবে তাই তারা 'culip-crack ending' এর পক্ষপাতি। আবার অনেকে চমকিত উপসংহার বা 'whip-crack ending' কেই ছোটগল্পের সমাপ্তির আদর্শ বলে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের বর্ষাযাপনের' সূত্র ধরেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন—

> "আর সব চাইতে বড়কথা, গল্পের সেখানে সমাপ্তি, সেইখান থেকেই তার আস্বাদনের আরম্ভ। তার বক্তব্য শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু ভাবের অনুসরণটি চলতে থাকবে পাঠকের মনে। এমন ভাবে বক্তব্যটি উপস্থিত করা হবে—যাতে সেটি শেষ হয়েও হতে চাইবে না; মানস যন্ত্রের নায়কী তারটিতে একমাত্র ঝঙ্কার দেবে ছোটগল্প-তারপর অনেকক্ষণ ধরে সঞ্চারিনী গুলিতে তার মুর্ছনা বাজতে থাকবে"[৭]

'টহলদার' গল্পের সমাপ্তিতে দেখা যায়—

> "পূর্ব গগনে শুকতারা ধকধক করিয়া জ্বলিতেছিল। রামদাস ছুটিয়া পালাইল। চোর, চোর-সে চোর! সদররাস্তা দিয়া চলিতে আর তাহার সাহস ছিল না। পাশের একটা গলির মধ্যে সে মোড় ফিরিল, সঙ্গে সঙ্গে কে তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। বাউল আবার চমকিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—কে? কেহ উত্তর দিল না! রামদাস দেখিল, এ তাহারই ছায়া"

গল্পের সমাপ্তিতে রামদাসের এই ছায়া আসলে তার স্পর্ধিত বিবেক। টহলদার রামদাস বাউল যে একদা গোসাঁইয়ের নামে চোর অপবাদ দেওয়ার জন্য শশীকে ধমক দিয়েছিল—"তুই মহাপাষণ্ড শশী, সাধু-সন্ন্যেসীর নামে অপবাদ দিতেও তোর লজ্জা হয় না" মিথ্যা কথা বলতে হবে বলে সে একদা অবাক হয়ে গিয়েছিল—শশী বলিল মিছে কথা বলতে তো বলছি না আমি। আমি চুরি করি নাই-ই কথা তুমি কেনে বলবে? তুমি বলবে, আমি কিছু জানি না, রামদাস যুক্তি শুনিয়া অবাক হইয়া গেল", ভূপতি চুরিকরা বার্ণিশ তার একতারার লাগাচ্ছে জেনে যার মুখ বিস্ময়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল— "বাউলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে চমকিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল, চুরি করে" সেই রামদাস বাবজী, সেই টহলদার রামদাস বাউল আজ চুরি করলো। —পাঠকের মনে এ ভাবনার প্রবাহ চলতে থাকবে। তার মনে কত গুলো প্রশ্ন জাগবে—টহলদারির বৃত্তিকে রামদাস কি আর ধরে রাখতে পারবে? শশী চুরি করলে শশীর চুরি সে কেমন করে ধরবে? ভূপতি মিস্ত্রীর সামনে সে কেমন করে দাঁড়াবে? যতীন যদি আবার বলে ও বেটা চোরের সঙ্গ আবার কেন? তার উত্তর সে কেমন করে দেবে? না কি এড়িয়ে যাবে? রাতের আন্ধকারে তার চুরি হয়তো ধরা পড়বে না। তাই শশী, ভূপতি, যতীন প্রভৃতি ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে চুরির মত

Scanned with OKEN Scanner

গোপন করে সে রক্ষা পেলেও নিজের বিবেকের হাত থেকে তার মুক্তি নেই—এই বিবেক তাকে ক্রমাগত তাড়া করে বেড়াবে। আর তার তাড়নায় রামদাস বাকী জীবনটা গলিরাস্তা ধরেই ছুটতে থাকবে? আর মোহের আলির মতো নিজেকে সতর্ক করতে মনে মনে কি বলবে—তফাৎ "যাও তফাৎ—যাও সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়"। তারাশঙ্করের ছোটগল্পের শিল্পরূপের ত্রুটির একটি হল-যথাস্থানে গল্পের সমাপ্তি ঘোষণা করার সত্যো মাত্রাজ্ঞানের অভাব-সংযমের অভাব, তারাশঙ্করের এ গল্পটি তার বিরুদ্ধে উঠে আসা অভিযোগের ব্যতিক্রমী প্রয়াস এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ তারাশঙ্কর টহলদার গল্পের উপস্থাপনের ক্ষেত্রে (Mode of representation) সাধারণ রীতি বা প্রথম পুরুষের জবানী ব্যবহার করেছেন।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পের রূপনির্মিতির দুর্বলতার দ্বিতীয়ক্ষেত্র হল তার গল্পে suggestivness বা ব্যঞ্জনাধর্মীতার অভাব। উপন্যাসের মতো ছোটগল্পে বর্ণনার অবকাশ নেই বলেই ছোটগল্পের অঙ্গিকের এক গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হল তার ব্যঞ্জনাধর্মীতা—ইঙ্গিত -গর্ভ ভাষা প্রয়োগ। হয়তো এ গল্পে ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র ব্যঞ্জনা ধর্মিতা চোখে পড়বে না তবুও সমগ্র গল্পে ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করার মতো, গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদেই আছে —"রামদাসের সম্মুখেই প্রকান্ড দলদলির জলাটা আসিয়া পড়িল। এই দলদলির সাঁকোটা পার হইয়া সম্মুখেই অনতি দূরে চণ্ডী দেবীর মন্দির ও আশ্রম' 'দলদলির' জলা তার আদিমতা নিয়েই রামদাসের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। চণ্ডীদেবীর মন্দির ও আশ্রম-অর্থাৎ ধর্ম-আদর্শ-অনাসক্তি। গল্পের প্রথমেই রামদাসের চরিত্রের এই যুগপদ দ্বন্দ্বকেই সংকেতিক করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—

'এখানকার আদি বড় লোক পরমানিকদের বহুকালের প্রাচীন আমবাগান। অযত্নে বাগান খানা এখন ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে"

মূল পদবী ছিল প্রামাণিক—অতীত বংশ গৌরব ও আভিজাত্য হারিয়ে হয়ে গেছে—পরমানিক। রামদাস ও কি তার অতীত বংশগৌরব হারায় নি? বাউলের যে সাধনা-সেই সাধনায় ক্রমাগত নিষ্ঠা না থাকলে তার থেকে বিচ্যুত হতে হয় যেমন প্রামানিকদের আমবাগান অযত্নে ঘন জঙ্গল পরিণত হয়েছে। এ গল্পে একবার মাত্র রামদাসকে চৈতন্য চরিতামৃত পড়তে দেখা গেছে, একবার একতারার মধুর সুরে গোষ্ঠ বিহারের গান জমে উঠলেও তার পেছনে লোভ কাজ করেছিল।

বাউলের অবলম্বন যে একতারা সেই একতারার 'বংশদণ্ডটির মাথায় গাঁটটিতেই একটি ফাট ধরিয়াছে'—'বংশ দণ্ড' শব্দটির প্রয়োগ গুরুত্ব পূর্ণ বংশদণ্ড শব্দের অর্থ যেমন 'বংশ খণ্ড'—তেমনি রামদাসের বংশের ব্যঞ্জনাও করা হয়েছে। বাঁশের শক্তপোক্ত যে ধারক শক্তি সেটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে রামদাসের বংশের যে অতীত বাউলের ঐতিহ্য সেখানে ফাটল দেখা দিয়েছে। রামদাস বারবার প্রয়াস চালিয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন, শশীর সঙ্গে কথোপকথনে- গল্পে আরো পাঁচবার বিষয়টি উল্লিখত হয়েছে-পঞ্চমবারে-'তাহার হাতের কাজও বন্ধ হইয়া গেল' অর্থাৎ অতীত বংশ গৌরবকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস করেও রামদাস ব্যর্থ হয়েছে। কাকের ডাক সেই অশুভ সংকেতকে বহন করে এনেছে—'গাছের

Scanned with OKEN Scanner

মাথায় বসিয়া একটা কাক কলকল করিয়া ডাকিতে ডাকিতে ডালে ঠোঁট ঘষিতেছিল'' গল্পের শেষে ধোঁয়ায় লণ্ঠনের চিমনিটা কালো হইয়া আসিয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া ভিতরের আলোক শিখাটাকে রক্তাভ দেখাইতে ছিল''- ধোঁয়ায় লণ্ঠনের চিমনী কালোহওয়া-রামদাসের মোহাচ্ছন্নতাকে সংকেতিত করে। আর লণ্ঠনের মিটমিটে আলোহল-তার বাউলের আদর্শবোধ। এই আদর্শবোধকে আচ্ছন্ন করেছে মোহ। 'হঠাৎ রামদাস উঠিয়া রশ্মিটুকুকে নিবাইয়া দিল' রামদাসের মনে টিকে থাকা লণ্ঠনের আলোর মতো ক্ষীণ আদর্শ বোধকে রামদাস বিসর্জন দিলেন। 'সে অন্ধকারে রামদাস নিজেকে ও দেখিতে পাইতেছিল না? নিজ্ঞান মন রামদাসকে সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছন্ন করেছে। বৈঠকখানার কার্নিশে পারাবতের গুঞ্জনে নিজ্ঞান মনের ভ্রান্তি ঘুঁচে গেছে স্পর্ধিত বিবেক জাগ্রত হয়েছে—ছায়া হল সেই জাগ্রত বিবেক।

উল্লেখপঞ্জি :

১। আমার সাহিত্য জীবন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২। গল্পগুচ্ছ-এপ্রিল-জুন-১৯৯৮ সম্পাদক-অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়। 'তারাশঙ্করের ছোটগল্পে মানুষ'-(প্রবন্ধ)-সুমিতা চক্রবর্ত্তী-পৃষ্ঠা-৩৯।

৩। ঐ, পৃষ্ঠা-৪০।

৪। সাহিত্য ও সংস্কৃতি তারাশঙ্কর স্মৃতিসংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৯ সম্পাদক-সঞ্জীবকুমার বসু, শিল্পরূপ তারাশঙ্করের ছোটগল্প-প্রবন্ধ-হীরেন চট্টোপাধ্যায়,-পৃষ্ঠা-১৯৮।

৫। ফ্রয়েড—সুনীল কুমার সরকার-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ-পৃষ্ঠা ৩২

৬। সাহিত্য ও সংস্কৃতি- তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৯ সম্পাদক সঞ্জীব কুমার বসু। শিল্পরূপ তারাশঙ্করের ছোটগল্প- প্রবন্ধ হীরেন চট্টোপাধ্যায় -পৃষ্ঠা-২০৩

৭। সাহিত্যে ছোটগল্প নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ-পৃষ্ঠা-১৭৪

৮। টহলদার গল্পের যে সমস্ত উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে তার সবগুলিরই অবলম্বন সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত, জগদীশ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, 'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ' প্রথম খণ্ড ।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা

১। তারাশঙ্কর দেশকাল সাহিত্য ঃ সম্পাদনা-উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, পুস্তক বিপনি।

২। সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সঞ্জীব কুমার বসু, তারাশঙ্কর সংখ্যা, বৈশাখ-আশাঢ় -১৩৭৯।

৩। দেশ- সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী-২১শে আগষ্ট ১৯৯৯।

৪। কথাসাহিত্য, শ্রাবণ ১৪০৫।

৫। পশ্চিমবঙ্গ-তারাশঙ্কর সংখ্যা, ১৪০৪, সম্পাদক-তরুণ ভট্টাচার্য-দিব্যজোতি মজুমদার।

Scanned with OKEN Scanner

মধুমাস্টার : স্বদেশ আমার স্বপ্ন

প্রত্যুষকুমার জানা

বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর যার অক্ষয় আসন-সেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে চতুর্থ সম্রাট হিসাবেই চিহ্নিত। সমকালীন পশ্চিমমুখী শিক্ষিত গল্পকারগণ যখন লেখকদের লেখক হিসাবেই নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করছেন তখন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ গল্পপাঠকের লেখক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গর্ববোধ করছেন - কথকের কণ্ঠস্বরে লেখক তারাশঙ্কর রাঢ় বাংলার ভৈরবী তপাশ্চর্যার অন্তরালে অন্তঃসলিলা মতো বহমান জনসমাজের যৌথ জীবনের কথা বলে চলেছেন। সেখানে বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক বিস্তারই শুধু ঘটেনি, ইতিহাস ও বাঙময় হয়ে উঠেছে। কালের গর্ভে কালান্তরের বীজটিকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর রচনা আজও নবীন আজ ও প্রাসঙ্গিক। সন্দীপন পাঠশালা, পদচিহ্ন, মহাশ্বেতা, শুকসারি কথা, গুরুদক্ষিণা, শতাব্দীর মৃত্যু ইত্যাদি উপন্যাসে মধুমাস্টার, পন্ডিতমশাই, ইত্যাদি ছোটগল্পে আমরা পেয়ে যাই - শিক্ষা, শিক্ষক চরিত্র, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ককে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে - শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে? —কার নৈতিক অধঃপতন? সে হয়তো স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। তবে ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক ভোগবাদী সভ্যতার অভিঘাত যে এর পেছনে ক্রিয়াশীল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। একথা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন।

লাভপুরের গ্রামীণ সমাজেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সামন্ততন্ত্রের শ্মশান যাত্রা আর অবাধগতিতে ধনতন্ত্রের বিকাশকে। ধনতন্ত্রের বিকাশকে তিনি যতই অপছন্দ করুণ পরিণতিতে যে তারাই জয়ী হবে একথা তারাশঙ্কর কখনোই অস্বীকার করেন নি। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের মধ্যে যে অভিজাত্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করাকে তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। এই সংস্কৃতি চেতনাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন শিক্ষক চরিত্রের মধ্যেও। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য মন্তব্য করেছিলেন —

> "যেকারনে পুরনো জমিদারেরা তারাশঙ্করকে আকৃষ্ট করে সেই একই কারণে ন্যায়রত্ন তার কাছে পরম আরাধ্য হন। এদের দু পক্ষের দিন শেষ, কিন্তু অস্তগামী সূর্যের মতো এরাও যেন ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শেষ রশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটায়"[১]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাক্তিজীবনে গল্প উপন্যাসে যে কয়েকজন শিক্ষক চরিত্র পাওয়া যায় তারা ও জমি নির্ভর - সেখানে গণদেবতার ফ্যালারাম চৌধুরীর মতো সুদখোর ব্যক্তিরা আছেন, ব্যক্তিজীবনে কান্তিবাবুর মতো 'সাক্ষাৎ কৃতান্ত' আছেন—ছাত্রদের উপর নির্মম নির্যাতনে যার হিংস্র আনন্দ। অন্যদিকে কঙ্কনার বাবুরা আর ছিরুপালের মতো

Scanned with OKEN Scanner

বর্বরেরা আছেন। আদর্শবাদী শিক্ষক ও পুরোনো জমিদারের আভিজাত্য ও আদর্শবোধ এদের নেই, সঙ্গত কারণেই এদের প্রতি তারাশঙ্করের শ্রদ্ধাও নেই।

ব্যক্তিগত জীবনে দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, আনন্দমঠ বন্দেমাতরমের ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র আর বিপ্লবী বীর শহীদ ক্ষুদিরাম এরাই কৈশোরে তারাশঙ্করের জীবনের আদর্শ। দেশ প্রেমিক, আদর্শবাদী শিক্ষকের প্রেরণা তার চরিত্র গঠনে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল। সঙ্গত কারণেই ব্যক্তিজীবনে ব্রজেন্দ্র মাস্টার, ন্যায়রত্নের মতো সংস্কৃত পন্ডিতেরা, দেবুঘোষ, 'সন্দীপন পাঠশালার' সীতারাম, 'পন্ডিত মশাই' গল্পের যতীন চাটুজ্জ্যে আর 'মধুমাস্টার' গল্পের মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের মতো আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষকেরা তাঁর কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

'মধুমাস্টার' ছোটগল্পটি বঙ্গশ্রী পত্রিকার, ১৩৪০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন আদিম বলিষ্ঠ ব্রাত্য মানুষের দুর্মর প্রাণরহস্যকে নিয়ে গল্প করার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন — "বোধ করি এদের কথা কেউ বিশেষ করে আগে লেখেন নি" তেমনি 'মধুমাস্টার' গল্প রচনার বারবছর পরে প্রকাশিত - 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসের ভূমিকায় তারাশঙ্কর লিখলেন —

> "বাংলা দেশের শিক্ষক জীবন অবহেলিত, অনাদৃত পাঠশালার শিক্ষক পন্ডিতমহাশয়দের তো কথাই নাই। এঁদের সুখ দুঃখ অবহেলিত, সমাজ জীবনে সামান্যতম সম্মান থেকেও এরা বঞ্চিত। এদের নিয়ে দু চারটি হাস্যরসাত্মক রচনা আমাদের সাহিত্যে আছে — সেইগুলি এদের প্রতি অবহেলার নিদর্শন, সীতারাম আমার কাছে বাস্তব তার মনের পরিচয় বহুবার পেয়েছি। তাকে সাহিত্যে রূপদানের বাসনা ছিল এতদিনে তা সম্ভব পর হওয়ায় আমি নিজে আনন্দিত হয়েছি সবচেয়ে বেশী"।[২]

যাঁর স্বদেশ চেতনা, সমাজ চেতনা, গণচেতনা-সবই ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গূঢ় আস্তিক্য বুদ্ধি ও অধ্যাত্ম চেতনায় এসে মিশেছে আর এই অধ্যাত্মচেতনা তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর সমাজ পরিবার ও সেকাল থেকেই তাঁর পক্ষে এই রকম রচনা সম্পন্ন করেই সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কোন্‌খানে প্রোথিত তা তারাশঙ্করের জানা —

> "বাঙালী হিন্দুর শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির প্রকাশভূমি কীর্তনের গান নহে, বাঙ্গালার সংস্কৃত পন্ডিতের শাস্ত্রজ্ঞান ও চিন্তা বৈষ্ণব আখড়ায় নহে, পন্ডিতের টোলে বাঙালী প্রতিভার পূর্ণতম বিকাশকে অনুসন্ধান করিতে হইবে"[৩]

তাই তো তার হাত থেকে জন্ম নেয় পন্ডিত মশাই এর মতো গল্প, মধুমাস্টারের মতো গল্প, আমাদের প্রবন্ধের মূল বিশ্লেষণ 'মধুমাস্টার' গল্প। 'মধুমাস্টার' গল্প আলোচনায় এই প্রাসঙ্গিক তথ্য ও তারাশঙ্করের শিল্পী মানসের প্রবনতাকে জানা জরুরী বলেই আমার মনে হয়। মধুমাস্টার গল্পের আলোচনায় দুটি দিক গুরুত্ব পাবে —

(ক) বিষয়ভিত্তিক

(খ) রূপনির্মিতি

(ক) বিষয়ভিত্তিক - 'মধুমাস্টার' গল্পে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এক দেশপ্রেমিক আদর্শবাদী

Scanned with OKEN Scanner

স্কুল শিক্ষক—ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বিলেতের কোন এক বাউন্ডুলে শ্বেতাঙ্গ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্যাদা ক্ষুন্ন করে এক গ্রন্থ লিখলে ক্রোধান্বিত মধু মাস্টার কেবল নিষ্ফল আস্ফালন করেই তার ক্রোধকে প্রশমিত করেন নি। মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে সত্য প্রকাশক প্রামানিক গ্রন্থ রচনা করেই তার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন। আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক শিক্ষক সম্প্রদায়ের স্বরূপ অসাধারণ রচনা কৌশলে তারাশঙ্কর তুলে ধরেছেন। 'মধুমাস্টার' গল্পের অনুপুঙ্ক্ষ পাঠে তিনটি বিষয় উঠে আসে:

১। ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার

২। সেকাল-একাল দ্বন্দ্ব ও নতুন কালের পদসঞ্চার

৩। শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক

১। ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় - ''সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস'' গ্রন্থের 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন - সমন্বয়, পরমতসহিষ্ণুতা, তত্ত্বানুসন্ধিৎসা, অহিংসা, আত্মদমন, ত্যাগ, অপ্রমাদ, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্য শিব আর সুন্দরের আবাহন, —এই সংস্কৃতির বিশেষত্বের সবগুলি একক ভাবে হয়তো গল্পে প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু সর্বতোভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে গল্পে পেয়ে যাই,—তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বিশেষত্ব। বিচারের পথে বা অনুভূতির পথে, দৃশ্যমান জীবনের অন্তরালে অবস্থিত শাশ্বত সত্য বা সত্তার অনুসন্ধান ও জীবনে তার উপলব্ধি - এই হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রধান কার্য। 'মধুমাস্টার' গল্পে বিলেতে প্রকাশিত গ্রন্থে মিশরীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বকে স্বীকার করে বলা হয়েছে - তারই খানিকটা ভারতীয়রা নকল করেছিল মাত্র। রামায়ণ-মহাভারত মিথ্যে, ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস মিথ্যে -- মধুমাস্টার-এর বিরুদ্ধে লিখতে চেয়েছেন। 'আই শ্যাল প্রুভ ইট' — এই প্রমাণ করার মধ্যে রয়েছে বিচারের পথ, সেখানে আবেগ সর্বস্ব দেশপ্রেম নেই। মধুমাস্টার প্রমান করতে চান বলেই বিলেতের এ গ্রন্থখানি আনা হয়েছে - তার সঙ্গে আরো তিন চার শত টাকার বই। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস লেখার জন্য এই বই গুলির প্রয়োজন। মাস্টার রাত্রি জেগে বই পড়েন প্রধান শিক্ষক শিববাবুর সঙ্গে আলোচনা হয়। এই গ্রন্থপাঠ, আলোচনার মধ্যে রয়েছে অপ্রমাদ সম্পর্কে সতর্কতা নিজের বুদ্ধিকে প্রমত্ত বা ঘোলাটে না করার প্রয়াস - যা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব। আমাদের গায়ত্রী মন্ত্রে আছে — ''ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'' ধী বা বুধিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা। এই জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা বা আকর্ষণ যা ভারতীয় জাতিকে নানান সময়ে নানান সংকট থেকে উত্তরণের শক্তি যুগিয়েছে। গল্পে দেখা যায় দুই জ্ঞানী মধুমাস্টার ও শিববাবু পরস্পরের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে মধুমাস্টার যেমন শিববাবুর সঙ্গে আলোচনা করেন-শিববাবু সম্পর্কে মধুমাস্টার জ্ঞানদাবাবুকে বলেন - ''একবার হেডমাস্টারের ওখানে যেতে হবে। তাকেও সঙ্গে নিতে হবে''। শিববাবুর জ্ঞানের প্রতি মধুমাস্টারের আস্থা আছে বলেই তিনি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। লেখক সচেতন ভাবেই জানিয়ে রেখেছেন - 'শিববাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র, সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মধুমাস্টারের প্রতি শিববাবুর মনোভাবটিও ব্যক্ত — ''শিবের মত

Scanned with OKEN Scanner

সরল এই আত্মভোলা মানুষটিকে বড় ভালোবাসিতেন — লোকটির জ্ঞান ও সামর্থ্যের উপর বিশ্বাসও ছিল তাঁহার অগাধ" সঙ্গত কারণেই "কোন প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিলে মধুমাস্টারকে না দেখাইয়া কখনও তিনি শেষ করিতেন না। মধুমাস্টার অম্লান বদনে তাঁহার লেখার উপরও দুই একস্থানে কলম চালাইয়া বলিতেন, এইখানটা এই করে দিলাম। শিববাবুও তাহাই মানিয়া লইতেন"। রায়বাড়ির কর্তা জ্ঞানদা বাবুর কাছেও মধুমাস্টার শ্রদ্ধার পাত্র। জ্ঞানদা বাবু 'মধুমাস্টারকে বড় ভালবাসতেন' তার জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই দুই ছেলের শিক্ষার ভার তিনি মধুমাস্টারের উপর দিয়েছেন। উপরন্তু শিক্ষিত না হলেও শিক্ষার প্রতি, বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বিলাতী বইয়ের প্রতিবাদে গ্রন্থ লিখতে চাইলে জ্ঞানদা বাবু বলেন "— লিখুন আপনি মাস্টার মশাই, আমি আপনাকে সাহায্য করব। বিদ্যে আমার নেই, কিন্তু অর্থ দিয়ে সাহায্য করব - যা খরচ হবে এতে, সমস্ত আমার"—জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা ও জ্ঞানীর সম্মান গল্পে রক্ষিত হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ধারণ করে রেখেছে। এই প্রসঙ্গে বিশ্ব বন্ধু ভট্টাচার্য্যের মন্তব্যের স্বীকৃত পাই — টোলের পন্ডিত মশাই ও পুরনো জামিদার "দুইপক্ষেরই দিন শেষ কিন্তু অস্তগামী সূর্যের মতো এরাও যেন ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শেষ রশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটায়"[৪]

অহিংসা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বিশেষত্ব। তারাশঙ্কর মানসিকতায় এই অহিংসার বীজ প্রোথিত বলেই ব্যক্তি জীবনে-শিক্ষক কান্তি বাবুর প্রতি তাঁর আসা নেই — ছাত্রদের নির্মম নির্যাতনেই যার হিংস্র আনন্দ। ভারতীয় সংস্কৃতির এই অহিংসার পেছনে আছে - সমস্ত জীবের প্রতি করুণা আর মিত্রভাবে দেখে তাদের কল্যাণ করার চেষ্টা। ন্যায় দৃষ্টি ও সহানুভূতি আছে বলেই হিংসার পথে মুর্ত্তি গ্রহণ করতে ক্ষেত্রবিশেষে বাধা নেই। 'মধু মাস্টার' গল্পে মধুমাস্টার উল্লিখিত ম্যালিসাস (Malicious) শব্দে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিদেশী সমালোচকের হিংসা-বিদ্বেষ আছে বলেই সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে ক্রুদ্ধ মধুমাস্টার বলেন — "বেটাদের নীল ডাউন করিয়ে দিতে হয় পৃথিবীর সামনে।" সুরেন্দ্র ছাত্র হলেও তার ব্যবহারে মধুমাস্টার বীতশ্রদ্ধ। সুরেন্দ্র তার পিতা জ্ঞানদা বাবুকে বোকা বললে মধুমাস্টার তাকে ভর্ৎসনা করেন — "দেখ সুরেন্দ্র, আমাকে তুমি যা বললে, তা বললে; কিন্তু স্বর্গীয় কর্তাকে বোকা বলা তোমার উচিত হয়নি তাই বা কেন! তোমারই উপযুক্ত হয়েছে" মধুমাস্টার কখনোই মিথ্যা ও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেন নি, তাই জ্ঞানদা বাবুর জায়গায় ছাত্র সুরেন্দ্র বসলেও তার উপযুক্ত মূল্যায়নে তিনি বিরত থাকেন নি।

দম বা আত্মদমন ভারতীয় সংস্কৃতির এক বৈশিষ্ট্য 'মধুমাস্টার' গল্পে মধু মাস্টারের মধ্যে সেই আত্মদমনকেই দেখতে পাই। বর্তমানে মৃত জ্ঞানদা বাবুর জমিদারির জায়গায় ছাত্র সুরেন্দ্র বসলে — মধু মাস্টার তার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হন। তার পর কলকাতায় ছাত্র সতীশ সিনহার বাড়িতে উঠলে সতীশ সন্তুষ্ট হয় নি। তার কারণ হিসাবে গল্পকথক জানিয়েছেন —

> "তাহার ছিল পান দোষ ও আনুষঙ্গিক দোষ, অভিভাবক বিশেষত মধুমাস্টারের মত অভিভাবক লইয়া চলা তাহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর"

বোঝা যায় সতীশের উশৃঙ্খল চরিত্রের বিপরীতে মধুমাস্টারের আদর্শায়িত চরিত্র।

Scanned with OKEN Scanner

তাছাড়া মধুমাস্টার থাকা খাওয়ার বিনিময়ে তার ছেলেকে পড়াতে চাইলে সতীশের জবাব — "আপনার মতো কঠোর শাসনের মধ্যে রাখা আমার মত নয়। শিশুরা হার্টলেস ....." হবে। আসলে মধুমাস্টারের কাছে যা আত্মদমন সতীশের কাছে তা হার্টলেস এর নামান্তর। অন্যদিকে পুত্র অরুণ বাবার কষ্ট লাঘব করতে চাকরি নিতে চাইলে তিনি তাকে তিরস্কার করেন – বলেন – "তাতে হয়তো আমার দেহের কষ্ট দূর হতে পারে, কিন্তু মনের কষ্টে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।" এর মধ্যে আছে মধুমাস্টারের ত্যাগ - শাশ্বত সত্তার দিকে দৃষ্টি রেখে নশ্বর বস্তুজগতের প্রতি তাঁর উপেক্ষা। শিক্ষক জীবনের সাধনা প্রসঙ্গে কোন এক উপন্যাসের উপোদ্ঘাতে তারাশঙ্কর ব্যক্ত করেছিলেন —

> "মানুষের প্রতিষ্ঠার কামনা যখন অন্নবস্ত্রের ভাবনাকে ভুলিয়ে দেয়; তখন তার পথ চলাটা ঠিক আকাশের দিকে মুখ তুলে পথ চলা। অতি বাস্তব মাটির পৃথিবীর বুকের বাধা বিঘ্নের কথা তখন সে ভুলেই যায়"[৫]

মধুমাস্টার খাওয়া দাওয়ার পর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যান, সন্ধ্যার পর 'টুইশান' করতে হয়, কখনো বা দুই টাকা লাভের জন্য রঙিন কাগজের ফুল তৈরী করে বিক্রি করতে হয়। পারিবারিক অর্থনৈতিক সমস্যা, বাস্তবজীবনে-সুরেন্দ্রের কটূক্তি, ও সাহায্য না করার নির্দেশ, ছাত্র সতীশের দুর্ব্যবহার ইতিমধ্যে শিববাবুর কাশীযাত্রা অর্থাৎ মধুমাস্টারের কাছ থেকে সরে যাওয়া, নিজের শরীরের ভঙ্গুর অবস্থা - প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাঁর মূল লক্ষ্য থেকে তিনি সরে আসেন নি। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি দাবা খেলার নেশা ত্যাগ করেছেন তার বড় শখের সামগ্রী উৎকৃষ্ট দুফসলী জমি বিক্রি করেছেন —

> "এই জমিটুকু খুবই উৎকৃষ্ট জমি। আখ, কলাই, গম প্রভৃতি সকল ফসলই হইয়া থাকে। এইটুকু মাস্টারের বড় শখের সামগ্রী ছিল"

বাস্তব জগতের প্রতিবন্ধকতা, জগতের দেহ, জমি, নেশা প্রভৃতি নশ্বর বস্তুর প্রতি উপেক্ষার ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন প্রাচীনত্বকে প্রমান করতে গিয়ে মধুমাস্টার ত্যাগ করেছেন নশ্বর বস্তুকে, করেছেন কৃচ্ছ্রসাধন —

> "সাধনা সামান্য বস্তু নয় অরুণ। কৃচ্ছ্রসাধন ভিন্ন সাধনা হয় না বাবা। আমার দিকে তাকিও না এ আমার সাধনা"।

সমস্ত কিছু ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েই তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস লিখেছেন – ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তার গ্রন্থ বিদেশে গৃহীত ও পুরস্কৃত হয়েছে।

সঙ্গত কারণেই মধুমাস্টার গল্পে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বিশেষত্ব 'সত্য'ও রক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে শিব মঙ্গলের দেবতা, কল্যানের দেবতা। কালতালীয় ভাবে হয়তো গল্পের দুই শিক্ষক একজনের নাম শিববাবু অন্যজন মধুমাস্টার –"শিবের মত সরল আত্মভোলা মানুষ" মঙ্গলের দেবতা শিবের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কিন্তু চরিত্রগত দিক থেকেও মধুমাস্টারের মধ্যে মঙ্গলবোধ কল্যাণবোধকে প্রত্যক্ষ করেছি। ভারতীয় সভ্যতার

Scanned with OKEN Scanner

ইতিহাস লিখতে জ্ঞানদা বাবু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলে – মধুমাস্টারের প্রতিক্রিয়া –

> "মাস্টার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, ভাব প্রকাশের ভাষা তিনি পাইতেছিলেন না কয়ফোঁটা জল তাঁহার চোখ দিয়া ঝরিয়া পড়িল। অবশেষে কহিলেন - আমাদের ভারতবর্ষ আর্যভূমি; আপনার মঙ্গল হবে জ্ঞানদাবাবু"।

পৌরানিক শিব চরিত্রের মতোই - অল্পে তুষ্ট - অল্পে রুষ্ট হয়ে যান। আর বর প্রদান করেন। জ্ঞানদাবাবুর মঙ্গল কামনায় মধুমাস্টারের সেই প্রবণতাই ধরা পড়ে। জ্ঞানদাবাবুর সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে - প্রগাঢ় স্বদেশ প্রেমের উচ্ছ্বসিত আবেগের বহির্গমন কয়ফোঁটা অশ্রুজল। মধুমাস্টার চরিত্রের মধ্যে এই মঙ্গলবোধ বা কল্যাণবোধকে আরো অন্যক্ষেত্রেও দেখেছি - গোকুলের দোকানে গিয়ে গোকুলের সঙ্গে কথোপকথনে অতীত স্মৃতি চারিতার মধ্যে তিনি গোকুলকে বলেন - "যা যা, নিজের কাজ কর গিয়ে। হাটের দিন, ব্যবসার ক্ষতি করিসনি বাবা"। কিংবা অরুণের উদ্দেশ্যে মাস্টারের বক্তব্য – "আমার কল্পনা তুমি অরুণ, আপন খেয়ালে আপনাকে তুমি নষ্ট করো না"

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতি প্রবন্ধে জানিয়েছেন অষ্ট্রিক - দ্রাবিড়, আর ভোট চীন ভাষা জনগন আর্য ভাষা গ্রহণ করে উত্তর ভারতে প্রাচীন হিন্দু জাতিতে পরিণত হল। আমাদের আলোচ্য গল্পে মধুমাস্টার ইংরেজী ভাষায় দক্ষ না হলে ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হত না। ছাত্র সৌরিন কে পড়ানোর সময় কিংবা তীব্র ক্রোধে বিলেতে প্রচারিত বই সম্পর্কে তার মন্তব্য – "অ্যাবসার্ড, এ ভাইল আন্ড ম্যালিসাস প্রোপাগান্ডা এগেনষ্ট আস্" এর মধ্যে তার প্রতিফলন আছে। এর মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় প্রবণতার অনুসন্ধান করা যেতে পারে। সর্বোপরি তারাশঙ্করের যে শিল্পী মানস তা গড়ে উঠেছে ভারতীয় ঐতিহ্য চেতনায় – তা যে কেবল ছোটগল্প নয়, তার উপন্যাসেও তার স্বীকৃতি আছে –

> "তারাশঙ্করের শিল্প চেতনায় যে ত্যাগ সত্য, প্রেম ও অহিংসার নিগূঢ় প্রতিফলন – এ সবেরই সঙ্গে অচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে জড়িয়ে আছে তারাশঙ্করের গভীর ঐতিহ্যনিষ্ঠ ভারত চেতনা। ধাত্রীদেবতার শিবনাথের ভাব কল্পনায়, গণদেবতা, পঞ্চগ্রামের দেবু ঘোষের সহন শীল পরম আশাবাদীর প্রসারিত জীবন দৃষ্টিতে, সন্দীপন পাঠশালার পন্ডিত সীতারামের ত্যাগ নিষ্ঠ শান্ত সংযত জীবন সাধনায়, আরোগ্য নিকেতনের জীবন মশায়ের দার্শনিক সুলভ নিরাসক্ত মৃত্যুচেতনায়, ভারতীয় সংস্কারেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই"[৬]

সেকাল-একাল দ্বন্দ্ব –নতুন কালের পদসঞ্চার

দাবা খেলার দৃশ্যে মাধব ভট্টাচার্যের সঙ্গে চাউল খরিদ্দার মহাজনের দালালের দাবাখেলা - আসলে সেকালের সঙ্গে একালের দ্বন্দ্ব।

মধুমাস্টার গল্পে আছে কালগত দ্বন্দ্বের মধ্যথেকে নতুন কালের পদসঞ্চার। পুরাতন সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ জ্ঞানদাবাবুর সঙ্গে তাই নতুন যুগের জমিদার সুরেন্দ্রের পার্থক্য গল্পে

Scanned with OKEN Scanner

ধরা পড়ে। জ্ঞানদাবাবুর চিরমুক্ত বৈঠকখানার দরজায় পর্দা দেওয়া এবং দরজার মাথার উপরে লেখা 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ' উপরন্তু জ্ঞানদাবাবুর বিদ্যা না থাকলেও বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু নতুন জমিদার সুরেন্দ্রের বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নাই। বাপ বাবুদের আমলের সোনা রুপার কলসি গড়গড়া ও তামাকের জায়গায় এসেছে সিগারেট। তার তারাশঙ্কর স্পষ্টতই বলেছেন – 'সে নব যুগের মানুষ'। আর এক নবযুগের মানুষ, মধুমাস্টারের অন্যতম ছাত্র হাইকোর্টের উকিল সতীশ সিংহের গেটে লেখা 'এস. সি. সিনহা উকিল হাইকোর্ট'। তারাশঙ্কর তার 'আমার কালের কথা'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে - লিখেছেন - 'প্রধান জমিদার বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাইনর স্কুলের। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠা করলেন হাই ইংলিশ স্কুলের। মাইনর স্কুলটি উঠে গেল"। 'মধুমাস্টার' গল্পে এই ইংলিশ স্কুলেরই কথা আছে – "পাশের গ্রামের রায় বাবুদের এম.এল. হাই ইংলিশ স্কুলে আজ ত্রিশ বৎসর থার্ড মাস্টারি করিতেছেন।"

৩। শিক্ষা-শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক–

মধুমাস্টার গল্পে সংস্কৃত পাঠের কথা নেই - কিন্তু মধুমাস্টারের সংস্কৃত জ্ঞানের পরোক্ষ ইঙ্গিত গল্প থেকে পাওয়া যায়। —কেননা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বকে প্রমাণ করার জন্য তা জরুরী। তবে ইংরেজী শিক্ষা ও 'একটা মনকষা কষে ফেল দেখি' কিংবা শিক্ষা ব্যবস্থার যে স্তর বিভাজন যেখানে - ম্যাট্রিকুলেশন, এফ. এ, বি. এ, এম. এ, বি.টি. এর কথা আছে।

'মধুমাস্টার' গল্পে তিনজন শিক্ষকের উল্লেখ আছে মধুমাস্টার, শিববাবু, তৃতীয় যে শিক্ষক যিনি শিববাবুর জায়গায় এসেছেন কেবলমাত্র তার উল্লেখ আছে কিন্তু চরিত্র স্বাতন্ত্র্যসূচক কোন বিশিষ্টতার উল্লেখ নেই। মধুমাস্টার ও শিববাবুর মধ্যে সৎ আদর্শনিষ্ঠ, দেশপ্রেমিক শিক্ষকের বৈশিষ্টই ক্রিয়াশীল – যাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকেই বহন করে চলেছেন। শিববাবুর সম্পর্কে তারাশঙ্কর লিখেছেন–"শিববাবু অতি মিতাচারী ব্যক্তি। নিয়মের লঙ্ঘন তিনি করেন না"। শিববাবুর কাশী যাত্রায় তাঁর অধ্যাত্মমানসের পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র গল্পটি মধুমাস্টার কেন্দ্রিক। তার নিয়মিত কর্মে ও কোন ত্রুটি নেই —

> "এই নিয়মিত কর্মটিতে কেহ কখনও তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখে নাই। জল ঝড়, শত দুর্যোগের মধ্যেও সাদা তালি দেওয়া বিবর্ণ ছাতাটি দীর্ঘ মানুষটির মাথার উপর বহুদূর হইতে দেখা যাইত"।

আর ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বকে প্রমাণ করতে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন।

গম্ভীর প্রকৃতির মধুমাস্টারের গর্জনে ছাত্র সৌরীন্দ্র ভীত হয়ে পড়ে যেখানে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক সহজ স্বতস্ফূর্ততা নেই বলে মনে হলেও পরে মধুমাস্টার স্নেহপ্রবণ মন নিয়ে সৌরীন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথনে সহজ সম্পর্কের ইঙ্গিত–প্রয়োজনে কঠোর প্রয়োজনে স্নেহ প্রবণতা। সৌরিন্দ্রের হাতে তিনি "ঝাঁকি দিয়া তিনি কহিলেন দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছিস। খুব করে ভাল ভাত খাবি, বুঝলি? হাম হাম করে" 'হাম হাম করে' ভাল ভাত খাওয়ার পরামর্শে মাস্টারের ছাত্র দরদী স্নেহ প্রবন মন আছে। ছাত্রের শারিরিক ও মানসিক সর্বাঙ্গিন বিকাশ সাধনেই তো শিক্ষকের কর্তব্য। অন্যদিকে প্রতিটি ছাত্রের সঙ্গে কথোপকথনে বাবা, বাপ্ ইত্যাদি স্নেহ সূচক শব্দগুলোও ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের আন্তরিক ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত

করে। নিজের ছাত্রের উপর যে আন্তরিক অধিকার, সেই অধিকারবশেই সুরেন্দ্রের বুকের উপর থেকে জ্বলন্ত সিগারেট তুলে ফেলে দেন। গল্পকার বলবেন – "অদ্ভুত প্রকৃতির লোক মধুমাস্টার" সত্যই অদ্ভুত না হলে, ছাত্রের প্রতি তার আস্থা না থাকলে কি কেউ কখনো - ছাত্রের বাড়িতে থেকে যাবতীয় কাজ (বই লেখার কাজ) করবেন বলে তাকে জিজ্ঞাসা না করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারতেন না। তারাশঙ্কর সচেতন ভাবেই দুই শ্রেণির ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্কের বৈপরীত্য দেখিয়েছেন। কৃতিছাত্রের একদিকে অরুণ (মধুমাস্টারের ছেলে) ও অন্যদিকে সতীশ সিংহ - সতীশ সিংহ কৃতী ও প্রতিষ্ঠিত ছাত্র হলেও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বিন্দুমাত্র নেই – সতীশের বাড়িতে গিয়ে মধুমাস্টার কিছুদিন থাকবে বলল – সতীশের বক্তব্য – 'অ, তা বেশ বেশ। ওই দিকে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফেলুন" — এর মধ্যেই আছে অসম্ভ্রম ও অশোভনীয়তা। মাস্টার মহাশয় কিছু দিন তার বাড়িতে থাকার বিনিময়ে তার ছেলেকে পড়াতে চাইলে তার সরাসরি বক্তব্য - - "বলতে সঙ্কোচ হয়'—নিছক সৌজন্যবশত ব্যবহৃত নিজের উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের তাগিদে শিক্ষক মহাশয়কে কটূ কথা বলতে ও তাড়িয়ে দিতে এদের বাঁধে না। অন্যদিক অরুন তাঁর পিতা, তাঁর শিক্ষকের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল 'বাবার ইচ্ছায় বাধা দিও না মা উনি যে কত বড় তা তোমরা বুঝবে না" কিংবা বাবার শারিরিক পরিশ্রম লাঘব করার জন্য চাকরি নেওয়ার পরিকল্পনা, বাবা যাতে কাজ করতে পারে তার জন্য স্কলারশিপের টাকা থেকে দশটাকা করে পাঠানোর ভাবনা। ছাত্র গোকুলকেও দেখবো মাস্টারের প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল। ভূমিষ্ট হয়ে শিক্ষককে প্রণাম, দাবা খেলায় মেতে হাটের কথা ভুলে গেলে গোকুল বাড়িতে হাট পাঠিয়ে দেয়, মাস্টার মশায়ের খাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ দিয়ে রান্না করে রাখে। খাওয়ার অনুরোধের মধ্যেও বিনীত আবেদন—গোকুল হাত জোড় করিয়া বলিল - 'বামুন দিয়ে রান্নাও আমি করিয়ে রেখেছি'। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস লেখার জন্য মাস্টারমশাই কলকাতা যেতে চাইলে গোকুল মাস্টার মশয়ের পরিবারের যাবতীয় মুদিখানার জিনিসপত্র দিয়ে আসতে চেয়েছে। এরই বিপরীতে আর এক ছাত্র সুরেন্দ্র—'যে বার তিনেক ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়া শিক্ষকদের উপর সন্তুষ্ট ছিল না' মধুমাষ্টার কাজের জন্য বইয়ের ফর্দ নিয়ে গেলে — "আপনি বই লিখবেন, তার জন্য বই আমায় কিনে দিতে হবে, তার মানে? শিক্ষককে মুখের উপর ধাপ্পাবাজ বলতেও তার বাধে নি। অন্যদিকে অসম্মান ও উপেক্ষায় সে বলে "বাবাকে ভালোমানুষ বোকা পেয়ে অনেকে অনেক রকম করে নিয়েছেন। কিন্তু তা আর হবে না। এ সব ধাপ্পাবাজি আমি অনেকবুঝি। বিলেতে ইংরেজের বইয়ের প্রতিবাদ লিখবেন শাঁখপুরের মধু মুখুজ্জে! আপনার লিখতে শখ থাকে, নিজে খরচ করে লিখুন গিয়ে"

এই নবযুগের মানুষ সুরেন্দ্রের কাছে সরলতা আর স্বদেশের সম্মান রক্ষার জন্য অর্থ খরচ বোকামি। শিক্ষককে ধাপ্পাবাজ বলতেও এদের বাধে না। শিক্ষকের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপিত 'শেখ' শব্দটি আপত্তিজনক। সহজেই বোঝাযায় ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের ক্রমঅবনতি এবং বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সংকটের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে।

সঙ্গত কারণেই হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েই বলতে হয় শিক্ষক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (Story [illegible]) [illegible] (Story of Character), [illegible] (Story of impression) [illegible] — "[illegible] from the Novel [illegible] in its essential unity of impression". [illegible] Single character, event and emotion

(Brander Mathews) তাই এই তিনটির মধ্যে যারই আপেক্ষিক প্রাধান্য থাকুক না কেন। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির আলোচনা অবান্তর।

ম্যাথুজের Single Character অর্থাৎ একটি গল্পে একটি মাত্র চরিত্র থাকবে? গল্পের ঘটনাবর্ত, তার বিশ্বাস যোগ্যতা, তার দ্বন্দ্বময়তাকে ফুটিয়ে তুলতে হলে অন্তত আরো একটি চরিত্রের প্রয়োজন তারাশঙ্করের 'মধুমাস্টার' গল্পে আপাতভাবে চরিত্র সংখ্যা অনেক – গোকুল, সুরেন্দ্র, সতীশ, সৌরিন্দ্র, মাধব ভট্টাচার্য, চাউল খরিদ্দার মহাজনের দালাল, শিববাবু, জ্ঞানদাবাবু, পুত্র-অরুণ, বরুণ, স্ত্রী, তাছাড়া, কন্যা চিন্ময়ী ও নতুন হেডমাস্টারের উল্লেখ আছে। সব মিলিয়ে চরিত্র সংখ্যা – মধু মাস্টার কে নিয়ে চোদ্দটি—। এই বিশাল চরিত্র সংখ্যা গোর্কির 'ছাব্বিশ জন লোক ও একটি মেয়ে' গল্পের কথা স্মরণ করায়। তাহলে কি তারাশঙ্করের মধুমাস্টার গল্প ছোটগল্প শিল্পরীতির সীমিত চরিত্রের সীমানাকে অতিক্রম করে গেছে? আসলে সচেতন ভাবে দেখলে বোঝা যায়— মাত্র দুটি চরিত্র গল্পে উঠে এসেছে – (ক) একটি সমবায়ী মানস চরিত্র যারা মধুমাস্টারের অভীষ্ট লক্ষ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে গল্পকে দ্বান্দ্বিক করে তুলেছ (সুরেন্দ্র, সতীশ, প্রভৃতি)। (খ) অন্যটি মধুমাস্টারের সমবায়ী মানস চরিত্র যারা তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যের পোষকতা করেছে। (জ্ঞানদাবাবু, শিববাবু, বরুণ, অরুণ, গোকুল, স্ত্রী, প্রভৃতি) স্বভাবতই মধুমাস্টার গল্পের চরিত্র সংখ্যা নিয়ে কারুরই আপত্তি থাকার কথা নয়।

এ গল্পের (unity of impression) প্রতীতি হল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষত্ব কিভাবে মধুমাস্টার গল্পে বিবৃত আছে তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আর ছোটগল্পের গঠনে উপযুক্ত ঘটনা সংস্থানের কথা ও বলা হয়েছে। পুনরুক্তদোষেদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনায় সে আলোচনা বাঞ্ছনীয় নয়। হয়তো গল্পের নামকরণে ও মধুমাস্টারকে কেন্দ্রে রেখে ঘটনা ও চরিত্র আবর্তিত হওয়ার কারণে একে চরিত্র মুখ্য ছোটগল্পের তালিকাভুক্ত করা চলে। কিন্তু ঘটনা সংস্থান ও প্রতীতি ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। যেখানে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জ্ঞানদাবাবু যথেষ্ট অর্থব্যয় করেছেন, শিববাবু তার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও সময় দিয়েছেন গোকুল সহযোগিতা করেছে, অরুণ স্কলারশিপের টাকা থেকে বাবার ভালো খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে সর্বোপরি স্ত্রী এবং পুত্র বরুণের সার্বিক সহযোগিতাও কর্ম নেই; তাহলে কেমন করে একে চরিত্র মুখ্য গল্প বলা যায়। আসলে —

> "গল্প যখন প্রায় অলৌকিক রসসিদ্দি লাভ করে তখন এই বিভাগ অর্থহীন হয়ে পড়ে – দেখা যায় গল্পে একই সঙ্গে চরিত্র ঘটনা এবং প্রতীতি এক সুমিত সমন্বয় লাভ করেছে সেখানে বিভাজন রেখা টানাই অসাধ্য ব্যাপার"[৯]।

এই প্রসঙ্গে মধুমাস্টার গল্পের সূচনা অংশের আলোচনা জরুরী ও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। একটি প্রতীতিকে সামনে রেখে ছোটগল্প রচিত হয় বলেই উপন্যাসের মতো অপচয়ের বিলাসিতা ছোটগল্প চলে না। এ প্রসঙ্গেই এডগার অ্যালান পো বলেন – 'মধুমাস্টার' গল্পের সূচনায় দেখি দাবার পক্ষ প্রতিপক্ষ মাধব ভট্টাচার্য যার জায়গা পরে মধুমাস্টার নিয়েছেন

Scanned with OKEN Scanner

- অন্যজন চাউল খরিদ্দার মহাজনের দালাল। তারাশঙ্করে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র আর ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বকে বহু উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করেছি। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার (গল্পে জ্ঞানদাবাবু) আর আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষকেরা ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধরে রাখার প্রানপন চেষ্টা করেছেন। খেলায় বার বার মধুমাস্টারের কণ্ঠে রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে –

(ক) "বাঁ পাটি লটর পটর, ডান পাটি খোঁড়া বাবা বদ্যিনাথের ঘোড়া,"

(খ) "আমার বরুণবানে অগ্নি নিভে যায়, এই বার মন্ত্রী যাবে করহ উপায়"

তা ছাড়া প্রতিপক্ষ হেরে গিয়ে পুনরায় একবাজি খেলতে চাইলে রামায়ণ মহাভারতের সমরনীতিই উঠে আসে—" যুদ্ধং দেহি? আচ্ছা প্রস্তুত আমি", শেষে যুদ্ধে মধুমাস্টারই জয়ী হয়। সঙ্গত কারনে এর মধ্যে গল্পের 'unity of impression' কে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু এই প্রসঙ্গকে যদি তারাশঙ্কর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন তাহলে হয়তো আপত্তির জায়গা থাকতো না। তার থেকেও বড় কথা গল্পটি যদি এই জায়গা থেকে শুরু হত —

"মধুমাস্টারের পুরা নাম মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। মাস্টার সে আমলের এফ. এ পাশ..."

তাহলে হয়তো শিল্পিত ছোটগল্পের নিখুঁত নিদর্শন হতে পারতো। এই প্রসঙ্গে হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য –

> "ছোটগল্পের একমুখিতা সম্বন্ধে কখনও কখনও সামান্য অসতর্কতার জন্যই এই গল্প শিল্পরূপের বিচারে নিখুঁত হতে পারে নি, এমন কি মধুমাস্টারের মতো অসাধারণ গল্প ও নয় ...কিন্তু শিল্পরূপের বিচারে সামান্য ত্রুটি, মধুমাস্টারের দাবা খেলার নেশাকে সূচনায় অত্যাধিক প্রাধান্য দান। ...উদ্দেশ্যের একমুখিতা সর্বত্র বজায় থাকলেই গল্পটিকে নির্দোষ বলা চলতো"[১০]

এবারে মধুমাস্টার গল্পের সমাপ্তির প্রসঙ্গেই আসা যাক। ছোটগল্প জীবনের খন্ডাংশের প্রতিবিম্বন বলেই তার সমাপ্তি শেষ কথা বলে না – এই প্রেক্ষণবিন্দু থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'সোনারতরী'র 'বর্ষাযাপন' কবিতায় বলেছিলেন – 'অন্তরের অতৃপ্তির কথা' সাঙ্গ করে ও 'হইল না শেষ' এর কথা। কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষীয় অনেকেই বলেন শিল্পসৃষ্টির সমাপ্তিতে পাঠক যদি তৃপ্তি না পায় তবে তাকে কেমন করে শিল্পসৃষ্টি বলা যাবে? সেজন্যই তারা 'culip-crack ending' বা তৃপ্তিদায়ক পরিসমাপ্তিতে বিশ্বাসী। আবার অনেকে চমকিত উপসংহার বা whip crack ending কে ছোটগল্পের আদর্শ সমাপ্তি বলেই মনে করেন। মধুমাস্টার গল্পের পরিসমাপ্তি কোন্ শ্রেণীর?

'মধুমাস্টার' এ ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস রচনার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মধুমাস্টারের জীবনেরও পরিসমাপ্তি হয়েছে। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পুত্র অরুণের উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ বাক্য — "অরুণ বই শেষ হয়েছে। ফোরওয়ার্ডটা বাকী থাকল - দেখিস্ তুই দেখিস" তারাশঙ্কর এই খানেই গল্প শেষ করতে পারতেন। তারাশঙ্করের ছোটগল্পের শিল্পরূপের ত্রুটির যার মধ্যে গল্প সমাপ্তিতে তারাশঙ্করের 'অসংযম' ও সঠিক স্থানে গল্প শেষ করার মতো মাত্রাজ্ঞানের অভাবের কথা বিদগ্ধ সমালোচকগণ তুলে ধরেছেন। কিন্তু মধুমাস্টার

Scanned with OKEN Scanner

গল্পে বিশেষত মধুমাস্টার গল্পের সমাপ্তি থেকে একথা প্রমান করা সম্ভব যে-তারাশঙ্করের মধ্যে মাত্রা জ্ঞানের অভাব ছিল না। তিনি সচেতন ভাবেই বিষয়টিকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নি। মধুমাস্টারের মৃত্যুর পর গল্পকথকের মন্তব্য —

"কাহিনীর এইখানেই শেষ; কিন্তু আরো একটু আছে।

সেটুকু না বলিলে শেষ হইবে কিন্তু সম্পূর্ণ হইবে না।"

প্রথমত : 'শেষ হইবে', 'সম্পূর্ণ হইবে না' থেকেই প্রমাণিত তারাশঙ্কর গল্প সমাপ্তির ক্ষেত্রে সচেতন ভাবেই - 'অন্তরের অতৃপ্তির' ক্ষেত্রকে অস্বীকার করেছেন। সম্পূর্ণ করতেই তিনি পরবর্তী অংশ যোগ করেন — যাতে গল্প পাঠক তৃপ্তি পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য — তারাশঙ্কর গল্প পাঠকের লেখক, সঙ্গত কারণেই পাঠকের তৃপ্তি বা উপভোগ্যতার কথা তিনি মাথায় রাখেন।

দ্বিতীয়ত : ১৩৪০ বঙ্গাব্দের, 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় মধুমাস্টার গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং এটি তার প্রথম দিককার গল্প। প্রথম দিককার গল্পে যে লেখক গল্পের শেষ হওয়া আর 'সম্পূর্ণ হওয়া' সম্পর্কে সচেতন, সঠিক স্থানে গল্প শেষ করার মতো মাত্রা জ্ঞানের অভাব তার আছে এ অভিযোগ কখনোই স্বীকার করা যায় না। তার থেকে বরং একথা মেনে নিলেই এই বিরোধের অবসান ঘটবে — জীবন শিল্পি হিসাবে তারাশঙ্কর এত উচ্চাসনে সমাসীন - যে জীবনকে দুমড়ে মুচড়ে আঙ্গিকের মোড়কে বাঁধতে চান না। বিশেষত মধুমাস্টারের মতো গল্পে কাহিনীর জায়গাতে গল্প শেষ হলে হয়তো—অন্তরে অতৃপ্তি রেখেই গল্প শেষ করা যেতো কিন্তু পাঠকের মনে কতগুলো অমীমাংশিত প্রশ্ন থেকেই যেত।

(ক) মধুমাস্টার কি ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বকে প্রমাণ করতে পোরেছিলেন?

(খ) ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে 'ধারকরার' অভিযোগ যারা তুলেছিলেন তাদের কি তিনি সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন?

(গ) নাকি ছাত্র সুরেন্দ্র মধুমাস্টারের পান্ডিত্যে যে সংশয় প্রকাশ করেছিল, এবং তার প্রয়াসকে ধাপ্পাবাজি বলেছিল সেটাই সত্য?

গল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিসমাপ্তিতে এসব প্রশ্নের উত্তর আছে এবং তা গল্পের ক্ষেত্রে আবশ্যিক।

প্রথমত : মধুমাস্টারের সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছে বিলেতে কাগজে কাগজে এই বইয়ের প্রশংসা করা হয়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব বিশ্বের কাছে প্রমাণিত, (বেটাদের নীল ডাউন করিয়ে দিতে হয় পৃথিবীর সামনে) প্রমাণিত হয়েছে রামায়ণ মহাভারতের অকৃত্রিম সভ্যতা, বিদেশের মাটিতে ভারতীয় সংস্কৃতির জয়যাত্রা ঘোষিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : বইয়ের জন্য পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্তি। তার আর্থিকমূল্য যাই থাক - সকলেই মধুমাস্টারে ছবি ছাপতে চায়। —এ পুরস্কার অমূল্য। আর এক অমূল্য পুরস্কার প্রাপ্তি মাধুমাস্টারের ক্ষেত্রে তিনি স্ত্রীর হৃদয়ের গোপন গুহায় এখনো অম্লান আছেন। ছোটছেলে বরুণ মায়ের কাছে এসে বাবার ছবি চাইলে —

> 'অকস্মাৎ মা একটি আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে বলিয়া ফেলিলেন আছে বাবা
>
> সেতো দেবার নয়।
>
> কেন?

প্রৌঢ় বয়সেও মায়ের মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়া ছিল, তিনি বলিলেন, না বাবা, ছবি তো নেই।...

"জীবন সঙ্গিনীর এই লজ্জাকরণ প্রৌঢ় অনুরাগই মধুমাস্টারের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার" এ গল্প পাঠে পাঠকের অন্তরে অতৃপ্তির কোন ক্ষেত্র থাকে না তাই একে 'culip crack ending' বলতে হয়।

ভূদেব চৌধুরী তারাশঙ্করকে বলেছিলেন - 'বাংলা ছোটগল্পের মহাকবি' তারাশঙ্করের গল্পে জীবনের গভীরতা আর জীবন রসসম্ভোগের ক্ষমতায় তিনি আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতন ভাবেই উদাসীন — "জীবনকে কত ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখলে এবং জীবনের রসসম্ভোগের কী গভীর ক্ষমতা থাকলে আঙ্গিকের এই বাধা চূর্ণ করা যায় তা অনুমান করেও বিস্মিত হতে হয়"।

সর্বোপরি তারাশঙ্করের গল্পের মূলীভূত শক্তিতে অগ্রজ রবীন্দ্রনাথের সানন্দ স্বীকৃতির উল্লেখ করেই এ আলোচনার শেষ করছি—

> "তোমার স্থূল দৃষ্টির অপবাদ কে দিয়েছে জানি নে কিন্তু আমার তো মনে হয় তোমার রচনায় সূক্ষ্মস্পর্শ আছে, আর তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয়, তাতে বাস্তবতার কোমর বাঁধা ভান নেই। গল্প লিখতে বসে না লেখাটাকেই যারা বাহাদুরি মনে করেন তুমি যে তাদের দলে নাম লেখাওনি এতে খুশি হয়েছি। লেখায় অকৃত্রিমতাই সবচেয়ে দুরূহ"।

তথ্যসূত্র ঃ

১. গল্পগুচ্ছ এপ্রিল-জুন-১৯৯৮, সম্পাদক-অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, 'তারাশঙ্করের স্বদেশ ভাবনার মূল সূত্র' (প্রবন্ধ) বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য পৃ: ৩৪

২. সন্দীপন পাঠশালা - ভূমিকা - তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, -তারাশঙ্কর রচনাবলী-সপ্তম খন্ড-মিত্র ও ঘোষ — ১৫.০১.১৯৪৬

৩. সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস - শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রবন্ধ - বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা, পৃ: ৩১-৩২

৪. গল্পগুচ্ছ - তদেব:

৫. সন্দীপন পাঠশালা পূর্বোক্ত - পৃষ্টা-৩

৬. সাহিত্যও সংস্কৃতি-তারাশঙ্কর বিশেষ সংখ্যা - বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৯
সম্পাদক সঞ্জীবকুমার বসু - তারাশঙ্করের উপন্যাস - প্রবন্ধ গোপিকানাথ রায় চৌধুরী - পৃ: ৪৬

৭. আমার কালের কথা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশমখন্ড মিত্র ও ঘোষ পৃ: ৩৫২

৮. সাহিত্য ও সংস্কৃতি - শ্রাবন - আশ্বিন - ১৩৯৯ - সম্পাদক সঞ্জীবকুমার বসু। শিল্পজগ: তারাশঙ্করের ছোটগল্প - হীরেন চট্টোপাধ্যায় পৃ: ২০৩

Scanned with OKEN Scanner

Jugalbandi Galpakar : Tarasankar Manik
[An intimate reading of representative short stories of Tarasankar Bandyopadhyay and Manik Bandyopadhyay]
Edited by Dhruba Kumar Mukhopadhyay.

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪০১
নভেম্বর ১৯৯৪
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত, পরিবর্জিত
প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ : দীপাবলি ১৪১৮
নভেম্বর ২০১১

© ভূমিকা : সম্পাদক

প্রকাশক :
বিকাশ সাধুখাঁ
৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : বিকাশ ধর

বর্ণ সংস্থাপন : প্রিন্টম্যাক্স, ইছাপুর

মুদ্রক : স্পেকট্রাম অফ্‌সেট
৫বি কুণ্ডু লেন,
কলকাতা - ৭০০০৩৭

ISBN : 978-81-921404-6-9

মূল্য ঃ ১৪০ টাকা মাত্র

Scanned with OKEN Scanner